রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ—১১শ সংখ্যা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী
১০৫, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ

এই সিরিজে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

বয়স্ক এবং অল্পবয়স্ক, স্ত্রী ও পুরুষ সকলের উপযোগী করিয়া উপন্যাসগুলি লিখিত।

প্রতি উপন্যাসে নূতনতর ঘটনা ও চরিত্র সমাবেশ। প্রত্যেকখানি বিভিন্ন ধারায় লিখিত।

পত্র-পত্রিকা ও গ্রাহকবর্গের দ্বারা এই সিরিজ উচ্চ প্রশংসিত।

রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ

* প্রকাশিত *

১। বাগান-বাড়ীর বিভীষিকা
২। মগের মুলুকে মোহনলাল
৩। রহস্যচক্রে রমলা
৪। মরণ-সঙ্কেত
৫। ডাকাত সুদর্শন
৬। মৃত্যু-তাণ্ডব
৭। ঝড়ের রাতে
৮। রাতের ভয়ঙ্কর
৯। রহস্য-যবনিকা
১০। মৃত্যু-পণ
১১। নিশীথ-চক্রান্ত

* যন্ত্রস্থ *

১২। নরপিশাচ

দ্বিতীয় বৎসরে এইভাবে প্রতিমাসে আরও বারোখানি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিশীথ-চক্রান্ত

এক

বনহুগলির গদাধর ঘোষ মারা যাইবার পর তাহার ওয়ারেশ পাওয়া সহজ হইল না। লোকটার ত্রিসংসারে যে কেহ আছে তাহা জানিবার কোন উপায় তাহার এটর্নী নির্দ্ধারিত করিতে পারিল না। অবশেষে এটর্নী কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে লাগিল। ছ'মাস বাদে আইনসঙ্গত ওয়ারেশ পাওয়া গেল। এলাহাবাদ হইতে অজিত ঘোষ তাহার ভগ্নী যুথিকাকে সঙ্গে লইয়া এটর্নীর কাছে হাজির হইল। গদাধরের জ্ঞাতিভ্রাতার ছেলে এই অজিত। কাগজপত্রে অজিতের নামও পাওয়া গেল। সুতরাং গদাধরের বনহুগলির প্রকাণ্ড বাড়ী এবং ব্যাঙ্কে মজুত নগদ টাকা সমস্তই অজিত পাইল। টাকার অঙ্কটা বিলক্ষণ মোটা। যুথিকার আনন্দের সীমা নাই। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া ভাই-বোন মিলিয়া অতি সঙ্কীর্ণভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল।

হঠাৎ ভগবানের কৃপায় প্রচুর অর্থ ও প্রকাণ্ড বাড়ী পাইয়া তাহারা তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প হইল। দিন-পনেরোর মধ্যে ভাই-বোনের জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গেল। বাড়ীখানা নূতন করিয়া রং করা হইল। দালাল মারফৎ ঝক্‌ঝকে 'শেভ্রলে' আসিয়া হর্ণ্ বাজাইতে লাগিল। দুইটা চাকর, একটা রাঁধুনী, এবং যুথিকার একজন নিজস্ব দাসী নিযুক্ত হইল। বড়লোক নাম বাহির হইলে আত্মীয়-স্বজন জুটিতে দেরী হয় না। দিন-সাতেক পরে এক অপরিচিত আত্মীয়ার নিকট হইতে পত্র আসিল। বিধবা শ্রীমতী মহামায়া সিংহ নাকি সম্পর্কে গদাধরের শ্যালী হইতেন। কাজেই 'অজু' আর 'যুথী-'র তিনি মাসী। ছেলেকে লইয়া তিনি তাহাদের সংসার গুছাইয়া দিবার জন্য আসিতেছেন। আসিলেন এবং সংসার গুছাইয়া দিন আর নাই দিন, নিজে বেশ করিয়া গুছাইয়া শিকড় গাড়িয়া বসিলেন। ছেলে রামহরি, অপদার্থ এবং অর্ব্বাচীন; তাহার উপর আবার কবি। অজিত ও যুথিকা রীতিমত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

আত্মীয়দ্বয়ের উৎপীড়ন সত্ত্বেও অজিত এবং যুথিকার নূতন জীবনের দিনগুলা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ভিতর দিয়াই বহিয়া যাইতেছিল। ইতিমধ্যে অজিতের নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল তাহার বন্ধু এবং যুথিকার ভাবী-বর মলয় বোস। দু'একদিন থাকিয়াই মলয়কে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদকের কাজ তাহার। সংবাদ-সম্পদনার ভার সে পাইয়াছে

কিছুদিন। ছুটির নাম নাই। তবে বলিয়া গেছে, ছুটি লইয়া শীঘ্রই আবার আসিবে।

ঠিকা ড্রাইভারকে বিদায় দিয়া অজিত পাকাপাকি ভাবে ড্রাইভার নিযুক্ত করিয়াছে। লোকটির নাম রঘু। ঠাণ্ডা, সভ্য এবং সুদক্ষ মেকানিক। অজিত ও যুথিকা দু'জনেই তাহাকে পছন্দ করিয়াছে। মোটরে চড়িয়া দু'জনে কাজে, অকাজে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু এই অব্যাহত আনন্দের মাঝখানে হঠাৎ একদিন অশান্তি এবং আতঙ্কের ছায়া দেখা দিল। এবং সে-ছায়া শীঘ্র অপসারিত হইল না।

দুই

লোকটাকে প্রথম দেখে ছোকরা উড়ে-চাকরটা। কাঁপিতে কাঁপিতে সে রাঁধুনির কাছে গিয়া খবর দেয়। রাঁধুনি প্রথমে বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু উড়িয়া-ভৃত্যের বিশ্বাস অটল। সন্ধ্যার পর সে মোড়ের মাথায় পানওয়ালার দোকানে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে, দেখে বাগানের মধ্যে—একটা ভূতের মতো লোক; মুখে কাপড় জড়ানো…'বিতিকিচ্ছি' দেখিতে, ঘাড় নীচু করিয়া ওৎ পাতিয়া যেন বেড়াইতেছে।

গল্পটা ক্রমে অজিতের কানে পৌঁছিল। অজিত মালতীকে ডাকিল। মালতীকে বিশেষ রকম ত্রস্ত ও শঙ্কিত দেখাইতে-

ছিল। তাহার ধারণা উড়ে-চাকর হটু সত্য কথাই বলিতেছে। কোন ছিঁচ্‌কে চোর বা ভিখারী মনে করিয়া অজিত কথাটাকে উড়াইয়া দিল। কিন্তু দু'রাত্রি পরে সে নিজেও সেই ছায়ার মত মুর্ত্তিটাকে দেখিতে পাইল…

রাত্রি তখনো বেশি হয় নাই। মাথাটা ভার বোধ হওয়াতে সে বাড়ীর সংলগ্ন বাগানের মধ্যে বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বকোণে পাঁচীলের ধার দিয়া আসিবার সময় হঠাৎ খস্ খস্ শব্দ তাহার কানে আসিল। অজিত থমকিয়া দাঁড়াইল। কেনা-ঝোপের পিছনে কে যেন চট্ করিয়া সরিয়া গেল! কে ও! হটুর কথা তাহার মনে পড়িল। আকাশে মেঘের আনাগোনা। কয়েক সেকেণ্ড পরে মেঘ সরিয়া গিয়া জ্যোৎস্না নামিল। অজিত তখন স্পষ্ট দেখিল, সার্কাসের ক্লাউনের মতো জামা গায়ে, মাথায়, মুখে লম্বা একটা আচ্ছাদন, এক রহস্যময় দীর্ঘ মূর্ত্তি একটা ঝোপের আড়াল হইতে আর-একটা ঝোপের আড়ালে চলিয়া যাইতেছে। অজিতের সাড়া সে বোধ হয় পায় নাই। কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করিয়া অজিত তাহার প্রতি ধাবিত হইল। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়াই লোকটা বসিয়া পড়িল। তারপর অজিত যখন ঝোপের পাশে গিয়া হাজির হইল, তখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই—লোকটা অদৃশ্য হইয়াছে।

মিনিট পনেরো পরে অজিত বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। তাহার মন বিচলিত ও উত্তেজিত। কে এই রহস্যময় ব্যক্তি? কী

বা তাহার উদ্দেশ্য ? সম্ভবত চুরী করিবার উদ্দেশ্যেই লোকটা ঘোরাঘুরী করিতেছে ! বাড়ীতে আসিয়া সে নীচেকার প্রত্যেক ঘরের দরজা জানলাগুলা পরীক্ষা করিল, তারপর শয়ন করিতে গেল, এ-বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিল না।

দু'তিন রাত্রি নিরুপদ্রবে কাটিল। তারপর চতুর্থ রাত্রে রীতিমত এক লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটিল।

রাত্রে আহারাদি সমাপনান্তে সকলে শয়ন করিতে যাইবার একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা পরে যুথিকা একখানা অৰ্দ্ধসমাপ্ত উপন্যাস আনিবার জন্য নীচে নামিল। উপন্যাসখানা পড়িতে পড়িতে সে নীচেকার ঘরে রাখিয়া আসিয়াছিল, এখন খেয়াল হওয়ায় শেষটুকু পড়িবার অদম্য ইচ্ছায় সে নীচে নামিল।

আলো নিবাইয়া দাসী-চাকরগুলা তাহাদের মহলে চলিয়া গেছে। চারিদিকে নিঝুম অন্ধকার। মহামায়া মাসী, আর তার গুণধর পুত্র দোতালার পশ্চিমদিকের তিনখানা ঘর দখল করিয়াছে। আটটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তাহারা শুইয়া পড়ে।

নীচে নামিয়া যুথিকা সোজা বৈঠকখানাঘরে ঢুকিল। বাগানের দিকের একটা জানলা খোলা। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া যুথিকার আঁচলের প্রান্ত দোলাইয়া দিয়া গেল। বাঁ হাত দিয়া সে সুইচ টিপিল। পরক্ষণেই অপরিসীম আতঙ্কে তাহার সৰ্ব্বদেহ হীম নিস্পন্দ হইয়া গেল। জানলার ধারে বন্যজন্তুর মতো ওৎ পাতিয়া একটা কালো মূৰ্ত্তি···তাহার

আকার নাই, চোখমুখ নাই···শুধু একটা রেখা, আর সেই রেখার চারিদিক ঘেরিয়া এক প্রকার হলদে আভা···অদ্ভুত, অপার্থিব ···যুথিকা চীৎকার করিয়া উঠিল···মাথার ভিতরটায় যেন কে কুড়ুলের ঘা মারিতেছে···যুথিকা জ্ঞান হারাইল।

মূর্চ্ছার ঘোর কাটিবার পর সে দেখিল, তাহার দাদা তাহার চোখেমুখে জলের ছিটা দিতেছে এবং একজন চাকর প্রবল জোরে পাখা হাঁকিতেছে! সোফায় বসিয়া কিছুক্ষণ পরে যুথিকা সুস্থ বোধ করিল। অজিতের প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু একটা ভাসাভাসা বর্ণনা দিতে পারিল মাত্র। ইতিমধ্যে বাড়ীর অন্য সকলে জাগিয়াছিল। ময়ামায়া মাসী এবং রামহরিও দর্শন দিল। অজিত পুলিশে টেলিফোন করিল!

কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয় থানার ইনস্পেক্টার আসিল। লোকটি এ-তল্লাটে বহুদিন কাজ করিতেছে। সকলে তাহাকে উদয়চাঁদ দারোগা বলিয়া জানে। জবরদস্ত কর্ম্মচারী উদয়চাঁদ। একঘণ্টা ধরিয়া চতুর্দ্দিক তল্লাস করিয়া এবং সকলকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সচকিত বিহ্বল করিয়া দিল। তারপর তাহার নোট লিখিয়া লইয়া যথারীতি তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রস্থান করিল। সকলের বোধ হইল যেন ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইয়া গেল। তখন কেহই অনুমান করিতে পারিল না যে তাহাদের অন্তরালে যে নিশীথ-চক্রান্ত ঘনাইতেছে, অচিরেই তাহা প্রাণান্তকর ভীষণ আকারে তাহাদের সম্মুখে দেখা দিবে।

তিন

পরদিন সকালে গতরাত্রির কথা কাহারো আর বড় মনে রহিল না। কয়েকদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিবার পর আজ নীল আকাশে সূর্য্যের অনাবৃত রশ্মি দুর-দিগন্ত পর্য্যন্ত উদ্‌ভাসিত করিয়াছে। ভাই-বোনে প্রফুল্লচিত্তে সারাদিন ধরিয়া ঘর গুছাইল। বৈঠকখানায় চারটা আলমারি সাজানো হইয়াছে; বই থাকিবে। কতক বই আসিয়াছে; বরাহনগরের একটি পুস্তক-বিক্রেতা তাহাদের বই সরবরাহ করিতেছে; কথা আছে বিকালে রঘু মোটর লইয়া তাহার বাড়ী গিয়া আরও কিছু বই আনিবে।

বিকালে অজিত যখন বাগানে বেড়াইতেছে, তখন রঘু আসিয়া সেলাম করিল। সে গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে। বাবু বা অন্য কেহ যদি কোথাও যাইতে চান, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। অজিত জানাইল, আজ আর কেহ বাহির হইবে না। রঘু মোটর লইয়া বই আনিতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে আবার আকাশে মেঘ জমিয়া বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। এখনি বৃষ্টি নামিবে। দ্বিতলের তিনটা ঘর ঠিক করা হইয়াছে। আর-একটা বাকী। যূথিকা কাজ শেষ না করিয়া ছাড়িবে না—উড়িয়া ভৃত্য হটুকে লইয়া চতুর্থ ঘরটা গুছাইতেছে। মহামায়া মাসী অনর্থক শক্তি ক্ষয় করেন না। তিনি গদি-আঁটা লম্বা সোফায় শুইয়া ডিটেক্‌টিভ বই শেষ করিতেছেন।

কবিপুত্র রামহরি ঘরের এক কোণে বসিয়া অজানা অদেখা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে ছন্দ মিলাইবার দুশ্চেষ্টায় চুল ছিঁড়িতেছে।

রাত্রি নামিল। সাড়ে আটটার সময় ঠাকুর আসিয়া জানাইল, রান্না প্রস্তুত। সকলে একত্রে আহার করে। যুথিকা সকলকে জানাইয়া দিল, এই দারুণ বর্ষায় অধিক রাত করিয়া লাভ নাই; আহার-পর্ব্ব শেষ করাই ভাল। তখন প্রবল জোরে বৃষ্টি আসিয়াছে।

আধ ঘণ্টা পরে নীচেকার বড় হলঘরে সকলে একত্রে আহারে বসিল। টেবিলে খাওয়া প্রথমে মহামায়া মাসী বিশেষ আপত্তির চোখে দেখিয়াছিলেন। অবশেষে নিজেই সম্মত হইয়া সকলকে লইয়া একসঙ্গে বসিতেন। বিধবা মানুষ, নিরামিষ খাইতেন; তাঁহার জন্য আলাদা তরকারী হইত।

মালতী তদারক করিতেছিল। হঠাৎ অজিত তাহাকে প্রশ্ন করিল—রঘু ফিরেছে?

সামান্য প্রশ্ন। কিন্তু মালতী অতিমাত্রায় বিব্রত হইল। কহিল—না। এখনো তো ফেরেনি।

—আশ্চর্য্য! তিন ঘণ্টা হ'য়ে গেল!

—কোথায় গেছে সে? প্রশ্ন করিল যুথিকা।

অজিত বলিল। যুথিকা কহিল—তাহালে হয়ত বৃষ্টিতে আট্‌কা পড়েছে।

কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইল। আহার শেষ হইলে, সকলে বৈঠকখানায় আসিয়া সমবেত হইল। আরও কিছুক্ষণ

পরে বাগানের প্রান্তে কাঁকর-বিছানো পথে গাড়ী চলার শব্দ হইল। অজিত কহিল—বোধ হয় রঘু ফিরলো।

যুথিকা মাথা নাড়িল—উঁহু। আমাদের গাড়ীর শব্দ নয়। হয়ত রঘুই এসেছে, অন্য গাড়ীতে।

মিনিট দুই-তিনপরে সদরদরজায় ইলেক্‌ট্রিক বেল্‌ বাজিল। এই দুর্য্যোগে কে দেখা করিতে আসিল? হটু বাহির হইতে একখানা কাগজ আনিল। তাহার উপর চোখ বুলাইয়া সবিস্ময়ে অজিত কহিল—গোয়েন্দা মোহনলাল! আমার কাছে কি প্রয়োজনে? আশ্চর্য্য! বলিতে বলিতে অজিত উঠিয়া গিয়া মোহনলালকে অভ্যর্থনা করিল।

ক্ষণকাল পরে অজিতের সঙ্গে মোহনলাল বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল। সকলেই উদ্‌গ্রীব, কৌতূহলী; মোহনলাল স্থির প্রশান্ত। বারেক সকলের মুখের পানে চাহিয়া অজিতের দিকে ফিরিয়া কহিল—এ ভাবে অসময়ে এসে আপনাদের বিরক্ত করলাম ব'লে মাপ করবেন অজিতবাবু। আপনারা আমায় চেনেন না। কিন্তু আপনার কাকা গদাধরবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ ছিল। তাঁর সময়ে আমি প্রায়ই এখানে আসতাম।

অজিত কহিল—আপনাকে চিনি না তা নয়, তবে পরিচয়ের সৌভাগ্য এতদিন হয়নি। কাকার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আপনি যে আমাদের খোঁজ নিতে এসেছেন, তার জন্যে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। যদি অসুবিধা না হয়, তাহ'লে দু'তিনদিন এখানে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাদের ধন্য করুন।

—দু'তিনদিন! কিন্তু! পরক্ষণেই মৃদু হাসিয়া মোহনলাল কহিল—আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন…তাছাড়া এ জায়গাটি আমার ভারী ভাল লাগে!

স্থির হইল, মোহনলাল এখানে রাত্রে থাকিবে। তাহার ঘর এবং শয্যা ঠিক করিয়া দিবার জন্য যুথিকা মালতীকে ডাকিল। মালতী আসিল, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় নয়; অস্বাভাবিক তাহার মুখের ভঙ্গী; দু'চোখে আতঙ্কের ছায়া!

—কি হয়েছে মালতী?

যুথিকার প্রশ্নের উত্তরে কম্পিতকণ্ঠে মালতী কহিল—সেই লোকটা…তাকে আবার দেখা গেছে।

চকিত হইয়া অজিত কহিল—কখন্?

ঢোঁক গিলিয়া মালতী জবাব দিল—আধ ঘণ্টা আগে। বামুনঠাকুর রান্নাঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছে।

ঠোঁট বাঁকাইয়া মহামায়া কহিলেন—গাঁজা খেয়ে বামুনটা হয়ত ভুল দেখেছে!

মোহনলালের দু'চোখে ব্যগ্র কৌতূহল। অজিত তাহার পানে চাহিতেই প্রশ্ন করিল—কে লোক? ব্যাপার কি! সকলেই মহা চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন দেখছি।

বিগত ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া অজিত কহিল—ভারী পিকিউলিয়ার ব্যাপার, নয়?

মালতী ধীরে ধীরে বলিল—তাছাড়া রাত্রে নানা রকম শব্দ হয়। সেজন্যেও সকলে বড় ভয়ে ভয়ে আছি।

—শব্দ ! কী রকম শব্দ ? সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল অজিত।

মালতী কহিল—রাত বারোটার পর শব্দ শোনা যায় ! কে যেন চলে বেড়াচ্ছে ; দেওয়ালে ঠক্ ঠক্ শব্দ ! সেদিন রাত্রে মনে হল, ভারী জুতো পায়ে দিয়ে কে যেন আমার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

মহামায়া নাক সিঁটকাইয়া কহিলেন—বাজে ! স্বপ্ন দেখেছিলি বোধ হয় !

—না, না, মাঠান, স্বপ্ন নয় ! শুধু আমি কেন ? ওদিককার ঘর থেকে বামুনঠাকুরও শুনেছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে যূথিকা কহিল—আমিও শুনেছি।

অজিত আরও অবাক !—তুমিও শুনেছো !

—হ্যাঁ, দু'বার। তিনরাত্তির আগে, আর কাল রাত্রে।

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা নাই। তারপর মোহনলাল বলিল—আমার বোধ হচ্ছে যেন হঠাৎ একেবারে একটা রহস্যের মাঝখানে এসে পড়েছি। রাত্রে আপনারা বাড়ীর মধ্যে কাউকে দেখেছেন ?

সকলে মাথা নাড়িল। কাহাকেও দেখা যায় নাই, শুধু শব্দ ! মহামায়া কহিলেন—মিছিমিছি তোমরা গোলমাল করছ। আমার মনে হয়…

কি তাঁহার মনে হয়, তাহা জানা গেল না। কারণ তাঁহার কথা শেষ হইবার আগেই ঘরের প্রান্তে প্রচণ্ড শব্দ হইল…এবং পরমুহূর্ত্তেই জানলার কাঁচ ভাঙিয়া একটা ভারী বস্তু ছুটিয়া আসিয়া অজিতের পায়ের কাছে পড়িল।

চার

মালতী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অন্য সকলে নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে বহুক্ষণ শুধু কাঁচের জানলার ভাঙা সার্সির দিকে তাকাইয়া রহিল। প্রথমে সজাগ হইল মোহনলাল; ছুটিয়া গিয়া জানলার ধার হইতে একটা আধ্‌লা ইঁট তুলিয়া লইল। ভুরু কুঞ্চিত করিয়া অজিতের পানে চাহিয়া কহিল—এ উপহারটি আপনাকে পাঠালে কে?

বিস্মিতকণ্ঠে অজিত জবাব দিল—ভগবান জানেন!

ঘরের মধ্যে বিস্ময়ের চাপা উত্তেজনা। মিনিট দুই নীরব থাকিয়া মোহনলাল কহিল—মনে হচ্ছে অজিতবাবু, আপনার ওপর কারুর আক্রোশ আছে। কোন চাকর-বাকরকে সম্প্রতি জবাব দিয়েছেন?

অজিত মাথা নাড়িল। আরও কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া মোহনলাল বাগানটা একবার ঘুরিয়া দেখিবার প্রস্তাব করিল। মেয়েদের বৈঠকখানায় থাকিতে বলিয়া অজিতকে লইয়া মোহন-লাল ঘরের বাহিরে আসিল। মহামায়া তাঁহার পুত্রকে যাইতে দিলেন না।

বাহিরে তখন ঝির্‌ঝির্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। চারিদিক ঝাপসা অন্ধকার। অজিত একটা টর্চ্চ লইয়াছিল। সেই টর্চ্চের আলোয় উভয়ে বাগানে নামিল। কেহ কোথাও নাই। গাছের

মাথায় বৃষ্টির শব্দ ছাড়া চারিদিকে অটুট স্তব্ধতা। যে ইঁট ছুঁড়িয়াছিল, সে বোধ করি এতক্ষণে বাগান পার হইয়া বহু দূরে চলিয়া গেছে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিল।

ঘরের ভিতর সকলে উৎকণ্ঠিতমুখে অপেক্ষা করিতেছিল। অপোগণ্ড কবি রামহরি মিহিগলায় কহিল—পারলেন তাকে আয়ত্বের মধ্যে আনতে? পরিচয় হ'ল কি তার সঙ্গে?

বিরক্তভাবে অজিত মাথা নাড়িল। একধারে মালতী দাঁড়াইয়াছিল। স্খলিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—রঘু! রঘুকে দেখতে পেলেন নাকি?

অজিত চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণ তাহার খেয়াল ছিল না যে, এখনো রঘু ফিরিয়া আসে নাই! কহিল—না, রঘুকে তো দেখতে পাইনি। কিন্তু এখনোও এলো না তো!

ভগ্নকণ্ঠে মালতী কহিল—নিশ্চয় তার কোন বিপদ ঘটেছে!

—কেমন ক'রে জানলে তুমি? প্রশ্ন করিল মোহনলাল।

—আমি···আমি জানি না। মালতী কহিল—আমি অনুমান করছি···

মহামায়া বলিয়া উঠিলেন—যত সব বাজে অনুমান! যাও, নিজের কাজে যাও।

মালতী চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচেক পরে বাগানের প্রান্তে আবার যেন মোটর চলার শব্দ! মুহূর্ত্তকাল উৎকর্ণ থাকিয়া যুথিকা বলিয়া উঠিল—আমাদের মোটর!

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অজিত বলিল—যাক, তাহলে রঘু ফিরলো! কিন্তু এত দেরী কেন!

মহামায়া বলিলেন—তখনি বলেছিলাম, তোমরা বাজে গোলমাল করছ! নানা কারণে দেরী হ'তে পারে; চাকা ফুটো হ'তে পারে, ধাক্কা লাগতে পারে···

—শব্দ থেমে গেল। যুথিকা বলিল—দরজার কাছ পর্য্যন্ত গাড়ী এলো না কেন! আঃ, রঘুটা যে কি···

মোটরের শব্দ থামিয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা। মিনিট তিনেক পরে সদর-দরজায় যেন করাঘাতের শব্দ শোনা গেল! অজিত বলিল—সদর-দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে! শুনতে পেলে যুথি!

—হ্যাঁ! যুথিকা ঘাড় নাড়িল।

—আশ্চর্য্য তোমরা! কৈ, আমি তো কিছু শুনতে পাইনি। বলিলেন মহামায়া।

মোহনলাল বলিল—অজিতবাবু ঠিকই শুনেছেন। বাইরের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে!

—আসুন মোহনলালবাবু! বলিয়া অজিত উঠিল। মোহনলাল প্রস্তুত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে অজিতের পিছু লইল। দুইটা ঘর ও একটা দালান পার হইয়া সদর-দরজা। অজিত দরজার খিল খুলিল। এক ঝলক তীব্র শীতল বাতাস বহিয়া আসিল। কিন্তু কোথায় কে? কাহারো চিহ্ন নাই। তবে কে আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিল! অজিত হাতের টর্চ্চ জ্বালিয়া

এদিক ওদিকে আলো ফেলিল! ও কি! দরজার পাশে একটা বাদামী-কাগজের বড় প্যাকেট! মোহনলাল প্যাকেটটা তুলিয়া লইতেই অজিত বলিল—আমার বইএর প্যাকেট! এই যে লেবেল! তাহলে নিশ্চয়ই রঘু ফিরেছে। কিন্তু সে এ-ভাবে সদর-দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল কেন? সে তো পিছনকার দরজা জানে। সেখান দিয়েই তো সে যাতায়াত করে…

অকস্মাৎ মোহনলালের কণ্ঠ দিয়া বিস্ময়োক্তি নির্গত হইল। প্যাকেটটা ঘুরাইয়া ধরিয়া বলিল—এখানটায় দেখুন অজিতবাবু! রক্ত লেগে রয়েছে।

অজিত দেখিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। প্যাকেটের গায়ে নানা স্থানে রক্ত! অজিত আঙুল দিয়া তাহা পরীক্ষা করিল। এখনো ভিজা। অর্থাৎ তাজা রক্ত!

পাঁচ

রুদ্ধশ্বাসে অজিত কহিল—তাহলে রঘু ফিরেছে। হয়ত কোন অ্যাক্‌সিডেন্ট্…

মোহনলাল কহিল—এগিয়ে গিয়ে খুঁজে দেখা যাক চলুন। প্যাকেটটা তো নিজে পায়ে হেঁটে এখানে আসেনি; হয়ত রঘুই এখানে রেখে অন্যদিকে চলে গেছে।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া টর্চ্চের আলো ফেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। মোহনলাল তাহার পাশে। বাগানে নামিবার

সিঁড়ির ধাপে রক্তের ফোঁটা…সিঁড়ির নীচের ধাপেও…তারপর আর নাই।…দূরে পথের শেষে একখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে! অজিতের মোটর। উভয়ে সেইদিকে অগ্রসর হইল। মোটরের সামনের চাকা দু'খানা কাঁকর-বিছানো পথের পাশে নরম মাটিতে পড়িয়া যেন বসিয়া গেছে। ভিতরে রঘু নাই। অজিত কহিল—ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। গাড়ীখানা রঘু এমন জায়গায় থামালে কেন?

মোহনলাল নীরবে এতক্ষণ আশপাশের জমি পরীক্ষা করিতেছিল; কহিল—আমার মনে হয়, কোন বস্তু বা মানুষকে চাপা পড়া থেকে রক্ষা করতে গিয়েই তাকে এইভাবে গাড়ী থামাতে হয়েছে হঠাৎ ব্রেক ক'সে! কিন্তু তারপর সে গেল কোথায়?

উভয়ে বাড়ীর পিছনদিকের বাগানটা দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। টর্চ্চের আলোয় মাটির উপর স্পষ্ট পদচিহ্নরেখা। অনেকগুলি পায়ের ছাপ! অজিত কহিল—মনে হচ্ছে যেন এখানে কোনরকম্ ধস্তাধস্তি হয়েছিল!

জমির উপর আলো ফেলিয়া মোহনলাল বলিল—আপনার অনুমান বোধ হয় মিথ্যা নয়। এইখান থেকে একজন ছুটতে আরম্ভ করেছে—পায়ের দাগ বাড়ীর দিকে চলেছে; দু'জন লোকের জুতোর ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত রঘু মোটরের মধ্যে জখম হয়নি; বাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছুবার পর সে আহত হয়েছে।

—কিন্তু সে গেল কোথায় ?

মোহনলাল জবাব দিল—সেটা আবিষ্কার-সাপেক্ষ। সদর-দরজা খোলা না পেয়ে হয়ত সে পিছনদিক দিয়ে বাড়ীতে যাবার জন্যে চেষ্টা করেছে। সিঁড়ির ওপরে অনেকখানি রক্ত গড়িয়েছে, সুতরাং এতখানি রক্ত-ক্ষয়ে সে যে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

বলিতে বলিতে মোহনলাল অগ্রসর হইয়া গেল। অজিত তাহার পিছনে। চতুর্দ্দিকে টর্চ্চের আলো ফেলা হইল, কিন্তু কোথায় রঘু, তাহার কোন চিহ্ন কোথাও নাই। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বাড়ীর মধ্যে আসিল। সকলে সদর-দরজার কাছে একটি ছোট ঘরে বসিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

ব্যগ্রভাবে যুথিকা প্রশ্ন করিল—কি দেখলে দাদা ?

—ব্যাপার গুরুতর। রঘুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

অবাক-বিস্ময়ে যুথিকা কহিল—রঘু আসেনি···

মহামায়া বলিলেন—অজিতের হাতে একটা প্যাকেট দেখছি। ওটা কে দিলে ?

—দরজার পাশে সিঁড়ির ওপরে পেলাম। যে এনেছে, তার দেখা পেলাম না।

—আশ্চর্য্য ! এ-প্যাকেট তো রঘুরই আনবার কথা। মহামায়া কহিলেন—প্যাকেট এলো, অথচ রঘু এলো না !

একপাশ হইতে রামহরি বলিয়া উঠিল—এ কি কৌতুক খেলা। এ যেন ভুলের মেলা।

অজিত তাহার রঙ্গরস বরদাস্ত করিতে পারিল না, কহিল—তুমি থাম, কবিশেখরের চেলা!

এমন সময় লাইব্রেরীঘর হইতে মালতীর তীক্ষ্ণ তীব্র আর্ত্ত-চীৎকার ভাসিয়া আসিল। সকলে চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরেই মোহনলাল সবেগে দালান পার হইয়া লাইব্রেরী-ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অন্য সকলে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মালতী থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মোহনলালের প্রশ্নের উত্তরে স্খলিতস্বরে বলিল—ঘরের···ভিতর ···দেখুন!

মোহনলাল ঘরের মধ্যে ঢুকিল; কয়েকমুহূর্ত্ত পরে তাহার গম্ভীর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—কেউ এখন ঘরের ভিতর আসবেন না। অজিতবাবু, কাউকে ঘরের মধ্যে আসতে দেবেন না।

কয়েক মিনিট অসহ্য স্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হইল। তারপর মোহনলাল ডাকিল—অজিতবাবু, শুধু আপনি আসুন ভিতরে।

অজিত ভিতরে প্রবেশ করিল। জানলার ধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া একব্যক্তি পড়িয়া আছে। তাহার জামাকাপড় রক্তে ভাসিয়া গেছে···তাজা রক্ত তখনো গড়াইয়া পড়িতেছে··· বুকের কাছে প্রকাণ্ড ক্ষত···লোকটির চোখ দুইটা উন্মীলিত··· নিস্প্রাণ দৃষ্টি···লোকটির দেহে প্রাণের কোন স্পন্দন নাই··· অজিতের দিকে ফিরিয়া মোহনলাল বলিল—এ কে? রঘু?

নির্ব্বাক বিহ্বল অজিত শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, রঘুই বটে।

ছয়

ঘরের চারিদিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মোহনলাল বলিল—এ জানলাটা খুললে কে জানেন?

অজিত ঘাড় নাড়িল—না, জানিনে। আমি যখন শেষ এ-ঘরে আসি, তখন জানলা তো বন্ধ ছিল।

মোহনলাল চিন্তিত হইল—ইতিমধ্যে জানলাটা খোলা হয়েছে। জানলার ওপরে রক্তের দাগ···জানলার বাইরেও। মনে হয়, রঘুকে বাগানের মধ্যে ছুরি মারা হয়···তারপর সে কোন রকমে জানলা বেয়ে ঘরে ঢোকে। জমি থেকে জানলা দু'ফুটের বেশী উঁচু নয়। এই রঘু লোকটির সম্বন্ধে আপনি কি জানেন অজিতবাবু, অর্থাৎ তার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে?

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া অজিত জবাব দিল—আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। প্রথমে মালতীর কাছ থেকে খবর পাই, তারপর তার সার্টিফিকেট প্রভৃতি দেখে তাকে চাকরি দি।

মুখ তুলিয়া মোহনলাল বলিল—তাহলে মালতী তাকে চিন্‌তো?

ঘাড় নাড়িয়া অজিত কহিল—চিন্‌তো। এর আগে দু'জনে একসঙ্গে কোথায় যেন চাকরি করেছে।

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া হলঘরে বসিল। যুথিকা দাদার মুখে ব্যাপার শুনিয়া হতভম্ব

এবং নির্ব্বাক। মহামায়াও কথা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। চাকর-দাসী-রাঁধুনী সকলেই ভয়ে কম্পমান। মোহনলালের মুখের পানে চাহিয়া অজিত কহিল—আশ্চর্য্য যোগাযোগ। ঠিক সময় বুঝে আপনি একেবারে একটা খুনের ব্যাপারের মাঝখানে এসে পড়েছেন! আশা করি, আপনার সাহায্য পাব আমরা?

মোহনলাল অন্যমনস্কভাবে একখানা বেতের চেয়ারের মধ্যে আধশোয়া অবস্থায় বসিয়াছিল; নম্রকণ্ঠে জবাব দিল—পাবেন আশা করি।

ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হঠাৎ অজিত কহিল—রামহরি কোথায় গেল?

মহামায়া কহিলেন—সে ভয়ে চেঁচামেচি করছিল। আমি তাকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি।

মোহনলাল বলিল—পুলিশ যখন আসবে, তখন তাঁকে আবার কষ্ট ক'রে বিছানা ছেড়ে নীচে আসতে হবে। কারণ পুলিশ তাঁকে দেখতে চাইবে এবং প্রশ্ন করবে।

চোখ তুলিয়া মহামায়া বলিলেন—তাকে দেখে বা প্রশ্ন ক'রে কোন ফল হবে না! সে এ-বিষয়ে কিছুই জানে না। সুতরাং সে যেমন ঘুমুচ্ছে, তেমনি ঘুমুবে।

মোহনলালের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দেখা দিল—কেউ কিছু জানে কি না জানে, তা পুলিশ সিদ্ধান্ত করবে? এবং কারুকে বাদ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর বাগানে মোটর ঢুকিবার শব্দ পাওয়া গেল। বোঝা গেল, অজিতের 'ফোন্' পাইয়া পুলিশ আসিয়াছে। উদয়চাঁদ দারোগা, সঙ্গে একজন জমাদার ও পুলিশের ডাক্তার আসিল। প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ করিয়া উদয়চাঁদ রিপোর্ট লিখিল। সরু লম্বা ছুরির দ্বারা লোকটিকে হত্যা করা হইয়াছে। বুকে ছুরি বসিবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় নাই—অন্ততঃ পাঁচ মিনিট সময় লাগিয়াছে।···নোট লিখিয়া উদয়চাঁদ নিহত ব্যক্তির পকেট খানাতল্লাসী করিল। একটা আধ-ছেঁড়া চামড়ার মনিব্যাগ, ছোট একটা ছুরি, একটা চাবীর রিং পাওয়া গেল। জিনিষগুলি তাচ্ছিল্যভরে সরাইয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া উদয়চাঁদ কহিল—মোহনলালবাবু, আপনি কোন কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন এর মধ্যে ?

মোহনলালকে উদয়চাঁদ দারোগা বিলক্ষণ চিনিত। তাই তাহাকে এখানে এ-সময়ে দেখিয়া মনে মনে দারুণ বিস্ময় অনুভব করিলেও মুখে তাহা প্রকাশ করে নাই। তাহার প্রশ্নের উত্তরে মোহনলাল মাথা নাড়িল। তারপর কহিল—আমার মনে হয় দারোগা সাহেব, এঁদের ঝি মালতীকে আপনার জিজ্ঞাসা করা দরকার। সে নিহত লোকটিকে চিনতো।

মৃদু হাসিয়া দারোগা কহিল—আপনাকে ছাড়া সকলকেই প্রশ্ন করব, মিঃ মিত্র। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আপনারা বলেছেন, জানলা বন্ধ ছিল আপনারা দেখেছেন। পরে দেখেছেন খোলা। কে খুলেছে জানা দরকার। কে খুলেছে ?

কিন্তু কেহই তাহার সে প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইল না। মিনিট দুই পরে মোহনলালকে লইয়া দারোগা হত্যাস্থল অর্থাৎ বাগানের অংশবিশেষ পরীক্ষা করিবার জন্য বাহির হইল। দারোগা ব্যস্ত উত্তেজিত। মোহনলাল স্থির এবং কৌতূহলী। দু'জনের হাতে দুইটা টর্চ্চ। টর্চ্চের তীব্র আলোয় বাগান আলোকিত হইল। বৃষ্টি তখন থামিয়াছে। তবে আকাশে মেঘের ভার কমে নাই। যে-কোন মুহূর্ত্তে আবার সুরু হইতে পারে। যে সব স্থানে পায়ের ছাপ দেখা গিয়াছিল, সে সব জায়গা জলে ভিজিয়া একাকার হইয়া গেছে। মোহনলাল ও দারোগা উভয়কেই নিরাশ হইতে হইল।

হঠাৎ এক সময়ে মোহনলাল একটি বিশেষ বস্তু আবিষ্কার করিল···ফিরিবার পথে জানলার নীচে মরশুমি ফুলগাছের পাশে টর্চ্চের আলো পড়িতেই সে দেখিল, গাছের মাথায় এক টুকরা কাগজ! কৌতূহলীচিত্তে কাগজখানা সে তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। দারোগা পাশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি দেখছেন মোহনলালবাবু?

—এক টুকরো কাগজ!

—কি যেন লেখা রয়েছে না?

—হ্যাঁ; লেখা রয়েছে: "আপনার বিপদ আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না। আপনার পক্ষে এ-বাড়ী বিপজ্জনক। সুতরাং সকলকে নিয়ে শীঘ্র এ-বাড়ী পরিত্যাগ করুন।"

লেখার তলায় কোন সই নাই।

নিশীথ আক্রান্ত

পাঁচ

কাগজখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া অবশেষে মোহনলাল কহিল—এতক্ষণে ইঁটছোঁড়ার অর্থটা বোঝা গেল।

উভয়ে বাড়ীর মধ্যে আসিল। কপালের ঘাম মুছিয়া উদয়চাঁদ কহিল—ইঁটে কাগজখানা জড়িয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, মোহনলাল-বাবুর এ অনুমান বোধ হয় মিথ্যা নয়। তাহলে এইবার অজিতবাবুর কাছ থেকে কয়েকটা কথা জানতে চাই।

অজিত দারোগার মুখের পানে চাহিল। উদয়চাঁদ প্রশ্ন করিল—কয়েকদিন আগে আপনার বাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল, এই মর্ম্মে আপনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন। যে-লোককে সে-রাত্রে দেখা গিছলো, সেই লোককে আজ রাত্রেও আবার দেখা গেছে—এ কি সত্যি?

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া অজিত জবাব দিল—শুনছি সেই একই লোক। তবে আমি তাকে নিজে দেখিনি।

উদয়চাঁদ আবার প্রশ্ন করিল—আপনার ড্রাইভার রঘু, কেন যে খুন হ'ল, সে সম্বন্ধে আপনি কিছু বলতে পারেন?

—না।

—সে আপনার কাজেই রাত্রে গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিল।

ঘাড় নাড়িয়া অজিত বলিল—হ্যাঁ। আমার জন্যে বই আনতে গিছলো বরানগর থেকে।

—কতদিন সে আপনার কাছে কাজে ভর্ত্তি হয়েছে ?

—প্রায় একমাস হবে।

—তার কাজে ও ব্যবহারে আপনি খুসী ছিলেন ?

—ছিলাম।

দারোগা আবার একই প্রশ্ন করিল—তাহলে তার জীবনের ইতিহাস কিছুই আপনি জানেন না ? তার চরিত্র কেমন ছিল···

—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি দারোগা সাহেব যে, তা আমি জানি না।

খাতায় কয়েকটা কথা নোট করিতে করিতে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া দারোগা কহিল—অদ্ভুত ব্যাপার ! কেউ কিছুই জানে না, অথচ···

—আর কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে ?

অজিতের প্রশ্ন শুনিয়া মুখ তুলিয়া দারোগা কহিল—না। আপাতত আপনার ছুটি। আপনার মাসী মহামায়া দেবীকে ডেকে দেবেন।

ক্ষণকাল পরে মহামায়া এ-ঘরে আসিলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে গিয়া দারোগা নিজেই নাজেহাল হইল। সংক্ষেপে যাহা বলিবার বলিয়া তিনি কহিলেন—তাহলে দারোগা সাহেব, আপনি জানতে চান, এ খুনজখমের ব্যাপারের সঙ্গে আমার কতটা অংশ আছে। আপনি কি অনুমান করেন ?—তখন উদয়চাঁদ সহসা কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না। কবি রামহরিকেও ডাকা হইল। কিন্তু তাহার নিকট কোন সদুত্তর পাওয়া গেল

না; কথায় কথায় সে ছড়া কাটে, কবিতা আবৃত্তি করে, না হয় বোকার মতো হাসিতে থাকে; দারোগা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপাইয়া উঠিল।

আট

এইবার মালতীকে প্রশ্ন করিবার পালা। উদয়চাঁদ মোহনলালকে কহিল—মালতীকে আপনি প্রশ্ন করুন, মিঃ মিত্র। আপনি তখন বলছিলেন না যে তার সঙ্গে রঘুর পরিচয় ছিল, তাই আপনার জেরা মনোযোগ দিয়ে শুনে তা থেকে আমি অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে পারবো।

মৃদু হাসিয়া মোহনলাল কহিল—আচ্ছা, তাই হবে ইনস্পেক্টার।

মালতী আসিল। চোখমুখ আরক্ত; ভীত ত্রস্তভাব। দু'একটা অন্য কথার পর মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মালতী, রঘুর সঙ্গে তোমার আগে থাকতেই চেনা ছিল কেমন?

ঘাড় নাড়িয়া মালতী জবাব দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আগে যেখানে কাজ করতাম, সেখানে তার সঙ্গে চেনা হয়।

—কতদিন আগে?

—প্রায় দু'বছর আগে।

মোহনলাল তাহার মুখের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তার খুন হবার কারণ সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো, বা কিছু বলতে পারো?

মালতীর চোখ ছুইটা ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়া আবার যেমন স্তিমিত ছিল, তেমনি ভাব ধারণ করিল; অস্ফুটকণ্ঠে কহিল—আমি কিছুই জানি না।

মোহনলাল কহিল—তুমিই তার কথা তোমার মনির অজিতবাবুকে বলেছিলে; সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তুমি জানতে যে, সে কাজের খোঁজ করছে?

মালতী মাথা নাড়িল। মোহনলাল প্রশ্ন করিল—তুমি তার ঠিকানা জানতে?

ঘাড় নাড়িয়া মালতী জবাব দিল—জানতুম। কাশীপুরের রতন নিয়োগীর গলিতে একটা ঘর নিয়ে সে থাকতো।

—তার সম্বন্ধে আর কোন খবর জানো?

ঘাড় নাড়িয়া মালতী কহিল—না।

আরও নানা প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু তাহাদের সদুত্তর পাওয়া গেল না। মালতী চলিয়া গেলে, উদয়চাঁদ বলিল—মেয়েটা অনেক কথাই চেপে গেল। রঘুর সম্বন্ধে অনেক কথা ও জানে।

রাঁধুনি এবং অন্য ভৃত্যদের প্রশ্নবাদ করা হইল, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। আধ ঘণ্টা পরে ইনস্পেক্টার উদয়চাঁদ বিদায় লইল। জানাইয়া গেল, ভোরবেলাই সে আবার আসিবে। একজন চৌকিদার বাড়ীর মধ্যে লাইব্রেরীঘরে পাহারায় নিযুক্ত রহিল।

যুথিকা একটা সোফায় বসিয়া ঢুলিতেছিল। অজিতের অবস্থাও তদ্রূপ। মোহনলাল উভয়কে শয়ন করিতে পাঠাইয়া

নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। মিনিট দশেক পরে আবার মোহন-লালকে দেখা গেল। ঘর হইতে বাহির হইয়া সে ধীরপদক্ষেপে নীচে নামিয়া আসিল। চৌকিদার তাহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—আপনি শুতে যাননি, হুজুর!

—না, সেপাইজি! মাথাটা বড্ড গরম হ'য়ে উঠেছে। একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগাতে চলেছি। এই বলিয়া মোহনলাল দালান পার হইয়া বাগানে নামিল।

* * * *

প্রবল ঝাঁকানিতে অজিতের ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিল, মোহনলাল তাহার বিছানার ধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! উঠিয়া বসিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে অজিত বলিল—কি ব্যাপার, মিঃ মিত্র···এমন সময়···

গম্ভীরস্বরে মোহনলাল বলিল—গুরুতর ব্যাপার অজিত-বাবু! আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আর একটা খুন হয়েছে। বাগানের শেষে পাঁচীলের ধারে লোকটা প'ড়ে আছে। দেখবেন আসুন, যদি তাকে সনাক্ত করতে পারেন!

নয়

বাগানে নামিয়া কাঁকর-বিছানো রাস্তা পার হইয়া পথের ধারে গেটের কাছে আসিয়া মোহনলাল থামিল। নীচু পাঁচীলের

তলায় একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—এইখানে রীতিমত ধস্তাধস্তি হয়েছিল। তারপর লোকটাকে হত্যা ক'রে এই ঝোপের আড়ালে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কতকগুলা ফনি-মনসার অড়ালে এক ব্যক্তির অসাড় নিস্পন্দ রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া আছে। বীভৎস দৃশ্য! অজিত শিহরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। লোকটা তাহার অজানা। ময়লা কাপড়, গায়ে একটা লম্বা কোট, জামা-কাপড়ে চাপ চাপ রক্তের দাগ।

—এ লোকটাকে কি ক'রে খুন করা হয়েছে মিঃ মিত্র?

মোহনলাল বলিল—রঘুকে যেমন ক'রে মারা হয়েছে, একেও তেমনি ক'রে, একভাবে ছুরি মেরে। চেনেন একে?

—উঁহু। জীবনে কখনো দেখিনি। কিন্তু এ কী সাংঘাতিক ব্যাপার! অজিতের কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত্ত।

—সাংঘাতিক, তাতে সন্দেহ নেই। মোহনলাল বলিল—এই দু'টো খুনের পিছনে কোন প্রকাণ্ড চক্রান্ত আছে। যাই হোক, উপস্থিত দারোগা উদয়কে খবর দেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কিছু করবার নেই।

চৌকিদার শুনিয়া হাঁ হইয়া রহিল। মিনিট পনেরা পরেই উদয়চাঁদ দারোগা আসিল। আবার একটা খুন! সুতরাং স্বভাবতই দারোগা অতিশয় বিচলিত। দারোগাকে লইয়া মোহনলাল পুনরায় একদফা মৃতদেহটা দেখিল। বোঝা গেল, রঘুর হত্যাকারী আর এই অজ্ঞাত লোকটার হত্যাকারী একই ব্যক্তি! এবং একই অস্ত্র দ্বারা দুইজনকে খুন করা হইয়াছে।

উদয়চাঁদ দারোগা মৃতের জামাকাপড় তল্লাস করিতে নিযুক্ত ছিল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া একটা চাপা বিস্ময়োক্তি বাহির হইল।

মোহনলাল প্রশ্ন করিল—লোকটাকে সনাক্ত করতে পারলেন নাকি, দারোগা সাহেব ?

—পেরেছি। ঘাড় নাড়িয়া উদয়চাঁদ জবাব দিল—এ একজন পুলিশ কর্ম্মচারী। নাম, মেহের আলি। বরানগর থানায় কাজ করত।

দশ

সকাল বেলায় মলয় আসিয়া উপস্থিত! কাল রাত দশটায় কাজ শেষ করিয়া সে তিন দিনের ছুটি নেয়। তারপর ভোরে উঠিয়া বনহুগলি অভিমুখে রওনা। দুই দুইটা খুনের ব্যাপারে যূথিকা যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। মলয় আসাতে তাহার সাহস এবং প্রফুল্লতা কিছু পরিমাণে ফিরিয়া আসিল। ব্যাপার শুনিয়া মলয়েরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাছাড়া মেহের আলির নাম শুনিয়া সে অধিকতর বিচলিত হইল। মেহের আলির সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। বরাহনগর অঞ্চলে কিছুদিন আগে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র এবং ডাকাতি সম্বন্ধে 'নিজস্ব' সংবাদ সংগ্রহ করিতে আসিয়া তাহার সহিত

মেহের আলির আলাপ হয় এবং সে মলয়কে বহু প্রকারে সাহায্য করে। সেই কাজের দক্ষতার জন্যই তো আপিসে মলয়ের প্রতিপত্তিলাভ এবং উন্নতির সুযোগ হয়। দারোগা মেহের আলির খুন হইবার ব্যাপারে মলয় যত না উত্তেজিত হইল, এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল তার চেয়ে বেশি। কথায় কথায় অজিতকে বলিল—দেখ, তোমার বাড়ীতে যে এই সব অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে, এর সঙ্গে তোমার খুড়োর কোন যোগ নেই তো!

মাথা নাড়িয়া অজিত কহিল—এ-রকম কোন 'আইডিয়া' আমার মাথায় আসেনি! কি-ভাবেই বা যোগ থাকতে পারে, তাও তো জানি না। আপনি কি বলেন মোহনবাবু?

মোহনলাল ধীরে ধীরে বলিল—আমার মনে হয় মলয়বাবুর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া, যে কাগজের টুক্‌রোটি পাওয়া গেছে, তারও গভীর অর্থ আছে। যে-লোক বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে, তার বিশেষ কোন অভিসন্ধি আছে এবং বাড়ী যদি খালি পায়, তবেই তার কাজের সুবিধে।

—কিন্তু কি চায় সে?

মোহনলাল কহিল—বেশ ক'রে ভেবে দেখুন। বাড়ীর মধ্যে খুব দামী জিনিষ কিছু আছে?

মাথা নাড়িয়া অজিত কহিল—রূপোর বাসন, আর কিছু গহনা আছে। তাছাড়া…

—না। তার চেয়ে দামী জিনিষ। যাক, উদয়চাঁদ আসছে কখন?

—এখনি এসে পড়বে বোধ হয়।

বলিতে বলিতেই উদয়চাঁদ দারোগার বেবি অষ্টিন হর্ণ্‌ বাজাইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। মলয় কহিল—আমি একটু একলা দারোগার সঙ্গে কথা বলে আসি। বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দারোগা তাহাকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কহিল—এরই মধ্যে আপনি এসে পড়েছেন?

মৃদু হাসিয়া মলয় বলিল—না দারোগা সাহেব, আমি রিপোর্টার হিসেবে আসিনি, এবং আগে কিছুই জানতাম না। অজিত আমার বিশেষ বন্ধু, সেই সূত্রে এদের বাড়ী এসেছিলাম, এসে শুনলাম, এই ব্যাপার! যাই হোক, আপনি যখন এ-কেসে আছেন, তখন আমার সুবিধাই হ'ল। ভিতরকার খবর পাব।

গম্ভীর মুখে উদয়চাঁদ কহিল—উপস্থিত কোন খবরই দেবার নেই। থাকলে জানাব।

মলয় কহিল—আমি আপনাকে তাড়া দিচ্ছি না। তবে আমি তদন্তের সময় সঙ্গে থাকবো। তাতেই···তাছাড়া মেহের আলি আমার বন্ধু ছিল, সুতরাং কর্ত্তব্য হিসাবেও···

মুখ তুলিয়া দারোগা কহিল—মেহের আলির সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?

—বিশেষ পরিচয় ছিল। সেবার কাশীপুরের সেই জহরৎ-

চুরীর ব্যাপারে···সেই যে লাভচাঁদ মতিচাঁদের দোকানে ডাকাতি···সে-কেসে আমি তো সব সময়েই তার সঙ্গে ছিলাম। কেস্‌টা মনে পড়ছে আপনার?

উদয়চাঁদ ঘাড় নাড়িল—হ্যাঁ, মনে আছে। চলুন, ভিতরে যাওয়া যাক। এঁরা সব কোথায়?

—ভিতরে আছে। চলুন।

উদয়চাঁদ ভিতরে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ অন্য কথার পর অজিত কহিল—মেহের আলি কেন এ-বাড়ীতে আসছিল, সেটা জানতে পারলে অনেক সুবিধা হ'ত।

মৃদু হাসিয়া মোহনলাল কহিল—তাহলে শুধু সুবিধাই হ'ত না অজিতবাবু, এ-রহস্য আর রহস্য থাকতো না। রাত্রে বাগানের মধ্যে যে-লোকটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেহের আলি সম্ভবত তাকে চিনতে পেরেছিল এবং এই চেনার অপরাধে তাকে প্রাণ হারাতে হ'ল।

উদয়চাঁদ কহিল—একটু ভুল হচ্ছে মোহনবাবু। মেহের আলি জানতো না যে এখানে কোনরকম রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সে এখানে আসতে গেল কেন হঠাৎ!

মোহনলাল ক্ষণেক চিন্তা করিয়া জবাব দিল—হয়ত নিজের কোন তদন্তের সূত্র ধ'রে এখানে আসবার প্রয়োজন তার হয়েছিল। ঘটনাচক্রে ছায়া-মূর্ত্তির সঙ্গে তার দেখা হয়।

উদয়চাঁদ মাথা নাড়িল। মোহনলালের ব্যাখ্যা তাহার মনঃপূত হইল না। সে যথারীতি পুনরায় তাহার তদন্ত সুরু

করিল এবং চাকর-বাকরগুলাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। মোহনলাল ইতিমধ্যে সতুকে ফোন করিতে গেল। কিছু পরে মলয় উদয়চাঁদকে ডাকিয়া কহিল—রঘুর লাশটা আমি একবার দেখতে চাই, দারোগা সাহেব; আপনার আপত্তি আছে?

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করিয়া দারোগা কহিল—না। আপত্তি কিসের। আমার সঙ্গে চলুন তাহলে।

তদন্ত শেষ হইলে উভয়ে চলিয়া গেল। বন্‌হুগলির থানার একটা ঘরে রঘুর লাশ পড়িয়া আছে। ঘরটা রীতিমত অন্ধকার। আলো জ্বালিয়া দিয়া দারোগা কহিল—তক্তার ওপর রঘুর মৃতদেহ আছে।

মলয় কৌতূহলী হইয়া অগ্রসর হইয়া গেল।—এই কি রঘু? তাহার বিস্ময়ের সীমা নাই।

দারোগা বলিল—দেখলেন?

মাথা নাড়িয়া মলয় বলিল—দেখলাম। কিন্তু ও তো রঘু নয়। ওর আসল নাম, জকু অধিকারী। পাঁচ বছর আগে কাশীপুরে লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ী থেকে যে হীরের মালা চুরী হয়েছিল, জকু ছিল তারই সর্দ্দার!

এগারো

বিষণ্ণ মনে জানলার ধারে দাঁড়াইয়া অজিত ভাবিতেছিল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য যদি বা আসিল,

তাহা ভোগ করিবার বুঝি উপায় নাই। অকস্মাৎ যেন কোন ভয়ঙ্কর দৈত্য আসিয়া বাড়ীটায় হানা দিয়াছে এবং তাহাদের সুখশান্তি হরণ করিয়া লইয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই কথা তাহার মাথার মধ্যে জাগিতে লাগিল। কে সেই অদেখা ছদ্মবেশী লোক? কেনই বা সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে? কী চায় সে? কী চায়? অজিত ভাবিতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে কোথাও কি কোন গুপ্ত ধনরত্ন আছে, যাহার জন্য লোকটা বারবার হানা দিতেছে। সম্ভব। বিনা কারণে এ-ভাবে কেহ আসিতে চায় না। মোহনলালও সকালবেলা ওইভাবের একটা কথা বলিয়াছিল। কিন্তু কোথায় আছে? অজিত টেবিলের ধারে আসিয়া বসিল। সে জানিত টেবিলের দেরাজে বাড়ীর একখানা নক্সা আছে। নক্সাখানাকে সে বাহির করিল। দেখা যাক, ইহার ভিতর বাড়ীর মধ্যে কোন স্থানে কোন গুপ্ত গহ্বর বা গুপ্ত-কক্ষের নির্দ্দেশ আছে কিনা। কিন্তু নক্সার মধ্যে কোন নির্দ্দেশই পাওয়া গেল না। কি মনে করিয়া অজিত তখন দেরাজের ভিতরকার অন্য কাগজপত্রগুলি একে একে বাহির করিতে লাগিল। এখানে আসিয়া এই কয়েকদিনের মধ্যে সে ভাল করিয়া এ-গুলি দেখিবার সময় পায় নাই।

এক বাণ্ডিল চিঠিপত্র। একটা ছোট ফাইলে আসবাবপত্রের ফর্দ্দ। একটা খাতায় খরচের হিসাব। গদাধর গোছালো-প্রকৃতির মানুষ ছিল! একটা দেরাজের শেষ প্রান্ত হইতে বাহির হইল একটা লম্বা খাম, তার চতুর্দ্দিকে গালা আঁটা।

কৌতূহলীচিত্তে অজিত গালা ভাঙিয়া খাম খুলিল। ভিতরে একখানি লম্বা কাগজ। তাহার উপর গদাধরের হাতের লেখা। রুদ্ধনিঃশ্বাসে অজিত লেখাটা পাঠ করিল। ইহাই তাহার খুড়ার উইল! উইল পড়িয়া অজিতের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নিমেষে রহস্য আরও গভীর হইল।

বারো

ভুরু কুঞ্চিত করিয়া বিস্ময়ের স্বরে উদয়চাঁদ দারোগা কহিল —অত্যন্ত গুরুতর কথা বলছেন মলয়বাবু! আপনার ভুল হয়নি তো?

ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে মলয় বলিল—না। আমার ভুল হয়নি। এই লোকটা জকু, তাতে আমার সন্দেহ নেই। আপিসঘরে গিয়ে বসি চলুন। সব কথা শুনবেন।

উভয়ে আপিসঘরে আসিয়া দেখিল, মোহনলাল সেখানে বসিয়া টেলিফোনে কাহার সহিত আলাপ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া দারোগা ও মলয় দু'জনেই বিস্মিত হইল। ক্ষণকাল পরে টেলিফোন রাখিয়া তাহাদের দিকে ফিরিয়া মোহনলাল বলিল—দু'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার ছিল দারোগা সাহেব; তাই এসেছিলাম। ইতিমধ্যে আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করছিলাম। এই যে, মলয়বাবু!

মোহনলাল আর বিশেষ কিছু বলিল না। উদয়চাঁদ

দারোগাও কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করিল না। কিন্তু মলয় নীরব থাকিতে পারিল না। এই মাত্র সে যে আবিষ্কার করিয়াছে, সবিস্তারে তাহা মোহনলালের কাছে বর্ণিত করিল। তাহার কথা শুনিয়া মোহনলাল কহিল—তাহলে কতকটা রহস্য পরিষ্কার হল। আমিও জকুর নাম শুনেছিলাম, কিন্তু তাকে বা তার ছবি কখনো দেখিনি। তাহলে মলয়বাবু, জকুর সম্বন্ধে আপনি যা জানেন বলুন আমরা শুনি। দারোগা সাহেবও বোধ করি শুনতে চাইবেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। বলিয়া উদয়চাঁদ তাহার নোটবই বাহির করিল।

মলয় কহিল—কিন্তু জকুর সম্বন্ধে আমি মেহের আলি দারোগার কাছেই যা কিছু শুনেছিলাম। সুতরাং আমি যা বলব, তা শোনা কথা মাত্র। লাভচাঁদ মতিচাঁদ জহুরীরা এক রাজার জন্যে আড়াই লক্ষ টাকা দামের এক হীরার নেক্‌লেস্ তৈরী করেছিল। নেক্‌লেস্ তৈরী হয়েছে, পরের দিন রাজা স্বয়ং এসে নিয়ে যাবেন, তার ঠিক আগের রাত্রে লোহার সিন্দুক ভেঙে নেক্‌লেস্ চুরী গেল। মেহের আলির ধারণা, এ ডাকাতি জকুর কাজ। কারণ লোহার সিন্দুক ভাঙা, ছদ্মবেশে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা, এ-সব কাজে তার জোড়া ছিল না। জকুকে ধরা হ'ল, তার নামে অন্য চুরীর দায়ও ছিল। অনেক রকমে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কিন্তু নেক্‌লেস্ পাওয়া গেল না—আজো পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। জকুর পাঁচ বছর জেল হ'ল। মেহের

আলি কিন্তু আশা ছাড়েনি। সে শেষ পর্য্যন্ত সেই নেক্‌লেস্‌-চুরীর তদন্তে নিযুক্ত ছিল। তার বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন সে এ-সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করতে পারবে। এই টুকুই মাত্র আমি জানি। তার বেশী কিছু নয়।

মলয় নীরব হইল। শ্রোতা দু'জনেও কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর দারোগা কহিল—জকু তাহলে রঘু নাম নিয়েছিল। কিন্তু সে অজিতবাবুর কাছে ড্রাইভারের চাকরি নিতে গেল কেন?

মাথা নাড়িয়া মলয় কহিল—তা জানিনে। তবে তার মৃত্যুর সঙ্গে হারানো হীরার নেক্‌লেসের সম্পর্ক আছে ব'লে আমার মনে হয়। আপনি কি বলেন মিঃ মিত্র?

মোহনলাল জবাব দিল—আমারও তাই মনে হয়। পাঁচ বছর! এখন থেকে পাঁচ বছর আগেকার কথা! তাহলে জকু বেশীদিন জেল থেকে বেরোয়নি। অথচ মালতী বলেছে, দু'বছর আগে···

হঠাৎ দারোগা সবেগে বলিয়া উঠিল—ও-কথাটা আমারও মনে হয়েছে মিঃ মিত্র। মেয়েটাকে আবার প্রশ্ন করতে হবে। আমি তখনই আপনাকে বলেছিলাম, মেয়েটা অনেক কথাই জানে, কিন্তু চেপে যাচ্ছে।

মোহনলাল ঘাড় নাড়িল। আর বিশেষ কোন কথা হইল না। কিছুক্ষণ পরে মোহনলাল বিদায় লইল। মলয় থানা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে ফোন করিল জেলে। জেলের অধ্যক্ষের সহিত তাহার অনেক দিনের জানাশোনা। সেখান

হইতে কয়েকটি সংবাদ লইয়া মলয় বরাহনগর অঞ্চলে গিয়া কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করিল। যখন অজিতের বাড়ীতে ফিরিল, তখন অপরাহ্ণ উত্তীর্ণপ্রায়। সারাদিন বাহিরে থাকিবার জন্য যুথিকা অনুযোগ করিল। যুথিকা ও মলয়ের ঘনিষ্ঠ আলাপের দৃশ্য দেখিয়া মহামায়া টিপ্পনি কাটিলেন। মলয় লজ্জিত হইয়া অজিতের খোঁজ করিতে লাগিল। লাইব্রেরীঘরে অজিতকে পাওয়া গেল। সে অতিমাত্রায় উত্তেজিত। তাহাকে দেখিয়া বলিল—এই যে মলয়! আমি এক দারুণ জিনিষ খুঁজে পেয়েছি!

—তাই নাকি! কি জিনিষ?

মলয়ের পিছনে পিছনে যুথিও ঘরে ঢুকিল।—কি জিনিষ দাদা!

—কাকার উইল। বলিয়া অজিত লম্বা খামের ভিতর হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া কহিল—আমি পড়ি, শোন তোমরা। "গদাধর ঘোষের শেষ উইল।...আমি আমার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমার ভাইপো অজিত ঘোষ ও ভাইঝি কুমারী যুথিকা ঘোষকে দিলাম। শুধু ফীডর রোডের এই বাড়ীখানি এবং বাড়ীর মধ্যে যাহা কিছু আসবাব আছে, তাহা তাহারা পাইবে না। আসবাব সমেত বাড়ীখানা পাইবে জকু অধিকারী। সে বর্ত্তমানে জেলে আছে; আমার বই-আলমারির প্রথম থাকে যে বইগুলি আছে, তাহাদের প্রতি জকুর বিশেষ অধিকার।"

উইলের শেষে যথারীতি নামধাম, বিবরণ, সাক্ষীর সই ইত্যাদি সমস্তই আছে। দুর্বোধ্য উইল। যে যাহার খুসীমত মন্তব্য করিতে লাগিল। মোহনলাল আসিলে তাহাকে উইল দেখানো হইল। এমন সময় মলয়ের একটি ঘোষণায় অজিত ও যুথিকা অতর্কিত বিস্ময়ে মুহ্যমান হইল। উইলে উল্লিখিত জকু অধিকারী আর রঘু একই ব্যক্তি! আসলে রঘু একজন নামজাদা পুরানো ডাকাত; ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে তাহাদের বাড়ী মোটরচালকের চাকরী লইয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া অজিত ও যুথিকা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না! সেই জকুকেই আবার তাহাদের খুড়া উইল করিয়া এই বাড়ীখানি দিয়া গেছে! সমস্তই যেন প্রহেলিকা।

ধীরে ধীরে মোহনলাল বলিল—কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই গদাধরবাবু এই বাড়ী জকুর নামে দিয়ে গেছেন; এই বাড়ী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই জকুর প্রাপ্য··· অর্থাৎ···

মলয় কহিল—বাই জোভ্! মনে হচ্ছে যেন···

মোহনলাল বলিল—এই বাড়ীর মধ্যে এমন কোন জিনিষ আছে, যা মাত্র দুটি লোকে জানতো, গদাধর এবং জকু! সেই জিনিষের সন্ধানেই জকু রঘু সেজে এখানে ড্রাইভারের কাজ নিয়েছিল।

রুদ্ধশ্বাসে যুথিকা কহিল—তাহালে সেই হীরের নেক্‌লেস্!···

মোহনলাল ঘাড় নাড়িল।

তেরো

কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অজিত বলিল—ধরলাম, কথাটা সত্যি, নেক্লেস অথবা জহরৎগুলো এই বাড়ীতেই আছে। কিন্তু এলো কেমন ক'রে?

শান্তকণ্ঠে মোহনলাল বলিল—আপনার কাকা এনেছেন।

সজোরে অজিত বলিল—তা হতেই পারে না। জহরত-চুরীর সঙ্গে কাকার কোন্ সম্পর্ক থাকতে পারে না।

তেমনিভাবে মোহনলাল বলিল—তা না থাকতে পারে, কিন্তু জকুর সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তা উইলের দ্বারা প্রমাণ।

মলয় কহিল—অদ্ভুত উইল। কোন মানে হয় না। তাছাড়া উইলের মধ্যে বইএর উল্লেখ—তারও কোন মানে তো খুঁজে পাই না।

—আমাদের কাছে মানে না থাকতে পারে। বলিল মোহনলাল—কিন্তু এ-কথা স্থির যে, বিশেষ কোন মানে করেই ওদের উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাক না, বইগুলো।

সকলে পুস্তকের আলমারির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সকলেই বিমূঢ় নির্ব্বাক। মোহনলালের দুই চোখে তীব্র অনুসন্ধিৎসার ছায়া। আলমারি তালাবন্ধ। চাবী খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন স্ক্রু-ড্রাইভারের সাহায্যে চাবীর কল খুলিয়া ফেলা হইল। উইলে লিখিত বইগুলি সারি সারি সাজানো। মলয় বইগুলি

নামাইয়া আনিতে লাগিল। ওই বইএর মধ্যে কি এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কোন সূত্র লুকাইয়া আছে?

হঠাৎ মোহনলাল বলিয়া উঠিল—ওভাবে নয়, মলয়বাবু। বইগুলি যেমনভাবে পরপর সাজানো ছিল, তেমনি ভাবে সাজিয়ে রাখুন।

মলয় বইগুলি সেইভাবে টেবিলের উপর রাখিল এবং প্রথম বইখানি তুলিয়া মোহনলালের হাতে দিল। সমস্ত বইগুলি একভাবে বাঁধাই করা। ধারে সোনার জলে নাম লেখা। প্রথম বইখানার নাম, 'শানিত গোধূলী'। মোহনলাল বইখানা খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার ভিতর কোন কাগজপত্র আবিষ্কার করিতে পারিল না। বুঝিল, ইহার আভ্যন্তরীণ কোন লেখার ভিতর দিয়া যদি কোন সঙ্কেত থাকে, তাহা তাহাদের বুদ্ধির অগোচর। সব বইগুলি টেবিলের উপর জড় হইয়াছে। সকলে বইগুলিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই উত্তেজিত কৌতূহলী। কেহই লক্ষ্য করিল না যে তাহাদের পিছনে জানলার বাহিরে একটা গাছের আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া এক মনুষ্য-মূর্ত্তি তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেছে।

সহসা মোহনলাল বলিয়া উঠিল—বোধ হয় সঙ্কেতটা পেয়েছি অজিতবাবু!

গাছের ছায়াতল হইতে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। মলয় কহিল—কোথায় সঙ্কেত?

—বলছি। তার আগে চাই একটুকরো কাগজ, আর একটা পেনসিল।

মোহনলালের প্রয়োজন মিটিতে বিলম্ব হইল না। মোহনলাল বইগুলি যে-ভাবে আলমারিতে সাজানে ছিল, সেইভাবে সাজাইয়া কাগজের উপর পরপর তাহাদের নামগুলি বসাইতে লাগিল। নাম লেখা শেষ হইলে দেখা গেল, মোট এগারোখানি বই সেই থাকে ছিল। মোহনলাল তাহাদের নামগুলি এইভাবে সাজাইল ঃ

শানিত গোধূলি
দানবীর কর্ণ
উলুখড়ের বিপদ
জীবন-দেবতা
রেবতীর পণ
রক্ত-তাণ্ডব
ভিখারীর প্রেম
তরুণী-হরণ
রজত-জয়ন্তী
হীরক-দুল
রাঠোর-নন্দিনী

মোহনলাল কহিল—পেয়েছি সঙ্কেত। জলের মত পরিষ্কার!

—কৈ, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

উত্তেজিতস্বরে মোহনলাল বলিল—প্রত্যেক বইখানির

নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে পরপর সাজিয়ে প'ড়ে যান—একটা লাইন তৈরী হবে। পড়ুন সকলে।

সকলে প্রতি গ্রন্থের প্রথম অক্ষরটি পর পর পড়িতে লাগিল : শা দা উ জী রে র ভি ত র হী রা।

যুথিকাই সর্ব্বপ্রথম পড়িল—শাদা উজীরের ভিতর হীরা।

ঘাড় নাড়িয়া মোহনলাল বলিল—ঠিক! ওই হ'ল সঙ্কেত!

চৌদ্দ

সকলে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। তারপর যুথিকা কহিল—হীরার অর্থ না হয় বোঝা যায়, কিন্তু 'উজীর' মানে কি?

মোহনলাল ঘাড় নাড়িয়া কহিল—তা আমি এখনো বুঝতে পারছি না। হয়ত কোন বই, বা ঐ ধরণের কোন জিনিষ…

বহু অনুসন্ধান করা হইল। বহু গবেষণা হইল। কিন্তু 'উজীর' অর্থহীন রহিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অন্যমনস্ক চিত্তে অজিত বলিল—একটা কথা মনে পড়ছে মোহনলালবাবু; 'উজীর' অর্থে দাবাবড়ের মন্ত্রীকে সঙ্কেত করা হচ্ছে না তো? বৈঠকখানার দেরাজে এক সেট দাবার ঘুঁটি আছে; ঘুঁটিগুলো মস্ত বড় বড়…

মোহনলাল বলিল—খুব সম্ভব, খুব সম্ভব। দেখা যাক চলুন।

সকলে বৈঠকখানায় আসিল। একটা বড় দেরাজের উপর একটি পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি বসানো ছিল। সেই দেরাজের ডালা

খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে অজিত দাবাবড়ের ঘুঁটি বাহির করিল। অজিতের কথা মিথ্যা নয়; এরূপ বৃহদাকার ঘুঁটি দেখা যায় না। বড়েগুলা তিন ইঞ্চি চার ইঞ্চি লম্বা; রাজা, মন্ত্রী এক-একটা ঘটির মতো স্থূলকায়!

সকলে যখন ঘুঁটিগুলি লইয়া ব্যস্ত, তখন বাগানের মধ্যে সেই ছায়ামূর্ত্তি নিঃশব্দে এ-ধার হইতে ও-ধারে সরিয়া গেল। পাতলা কাপড়ের আচ্ছাদনের অন্তরালে তার মুখের রেখা অত্যন্ত কঠিন এবং হিংস্র। ঘরের ভিতরকার মানুষগুলির কার্য্যকলাপ সে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করিতেছে! কিছুক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতর দিয়া ছায়ার মত বাড়ীর পিছন দিকে চলিয়া গেল। যে-স্থানে আসিয়া থামিল, তাহার উপরেই লাইব্রেরী-ঘরের জানলা। ছায়ামূর্ত্তি সেই জানলা বাহিয়া ঘরে ঢুকিতে মনস্থ করিল।

*   *   *   *

দাবার ঘুঁটিগুলি সকলেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে—বিশেষ করিয়া সাদা রঙের মন্ত্রীটা! কিন্তু ভিতরে তো কোন শব্দ নাই। অন্যগুলিও যেমন নিরেট, তাহাও তেমনি। মোহনলাল কিন্তু নিশ্চয় বুঝিয়াছে, অন্য ঘুঁটিগুলির সহিত ইহার ওজনের পার্থক্য আছে। অন্যগুলির তুলনায় শাদা মন্ত্রীটা বেশী ভারী। মলয়েরও তাহাই অনুমান। কিন্তু ইহাকে খুলিবার

পথ তো নজরে পড়িতেছে না। অবশেষে এমন সুন্দর জিনিষটাকে কি ভাঙিতে হইবে! মোহনলাল কহিল—একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি। একটা বড় দেখে পিন্ আমায় দিতে পারেন?

যুথিকা একটা লম্বা ব্রোচ আনিয়া দিল। তাহার ধারালো পিন্‌টি সোজা করিয়া মোহনলাল ঘুঁটির মাথার উপরকার সরু একটি অদৃশ্যপ্রায় ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল এবং একটু জোরে চাপ দিতেই ঘুঁটির নীচেকার অংশ খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মোহনলালের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘুঁটির গর্ত্তের ভিতর হইতে প্রথমে বাহির হইল অনেকখানি তুলা। এবং অচিরকাল মধ্যেই তুলার ভিতর হইতে বহুসংখ্যক জ্বলজ্বলে হীরকখণ্ড টেবিলের উপর ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের গায়ে আলো পড়িয়া ঘরের চারিদিকে যেন বিদ্যুত খেলিয়া গেল। হীরকখণ্ড-গুলির দ্যুতি সকলের চোখ ধাঁধিয়া দিল।

বিস্ময়-বিহ্বলকণ্ঠে অস্ফুটে যুথিকা বলিল—হীরে! কী জ্বলজ্বল করছে! নেক্‌লেস্ ভেঙে হীরেগুলো খুলে এর মধ্যে রাখা হয়েছে।

মোহনলাল কহিল—তাহলে এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এরই জন্যে জকু রঘুবেশে এখানে চাকরি নিয়েছিল।

লুব্ধনেত্রে হীরাগুলির দিকে চাহিয়া মহামায়া বলিলেন—এরই দাম আড়াইলক্ষ টাকা!

ঘাড় নাড়িয়া মোহনলাল বলিল—আশ্চর্য্য নয়! এমন নিখুঁত হীরে একসঙ্গে এতগুলো দেখা যায় না। যাই হোক,

এ-গুলোকে পুলিশ হেপাজতে দিতে হবে। উপস্থিত শাদা মন্ত্রীটার পেটেই থাক। মন্ত্রীমশাই অনেকদিন এ-গুলিকে সযত্নে পাহারা দিয়েছেন। আশা করা যায়, আরও দু'চারদিন…

এমন সময় অকস্মাৎ ঘরের আলো নিবিয়া গেল! চারিদিকে থমথমে অন্ধকার!

পনেরো

যূথিকা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে অজিত কহিল—আলো নেবালে কে! হটু, হটু!

এই বলিয়া সে ঘরের বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলোকরশ্মি ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল। দরজার প্রান্ত হইতে বিকৃতগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কেউ নড়াচড়া কোরো না! আমার হাতে পিস্তল!

মলয় স্পষ্ট বুঝিল, তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মোহনলাল একটা অস্ফুট উক্তি ঠোঁটের মধ্যে চাপিয়া রুদ্ধ করিল। অজানা মানুষটার হাতের টর্চ্চের তীব্র আলো সকলের চোখ ধাঁধাইয়া দিয়াছে—আলোর পিছনে যে-ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে মোটেই দেখা যাইতেছে না। কয়েক মুহূর্ত্ত বিহ্বল থাকিয়া অজিত কহিল—একি বাঁদরামি…কে তুমি?

শান্তকণ্ঠে জবাব আসিল—কে আমি, সে খোঁজে আবশ্যক নেই। আমি হীরকখণ্ডগুলি চাই!

সকলে নীরব ; যেন বজ্রাহত ! তাহা হইলে, তাহারা যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহাই ! অজ্ঞাত ব্যক্তি কহিল—চট্‌পট্ দিয়ে দাও হীরেগুলো···

—যদি না দিই ? মোহনলাল কহিল।

—তাহলে আমি গুলি চালাবো। প্রথমে মেয়েটিকে গুলি করব ! আমি তোমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি—আমি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি না—আমি···

মলয় বলিল—দিয়ে দিন মোহনলালবাবু ! কাজ নেই···

—চুপ করুন ! লোকটা দম্ দিয়ে কাজ হাঁসিল করবার চেষ্টায় আছে। বলিল মোহনলাল।

—হুঁসিয়ার ! অজ্ঞাত ব্যক্তি গর্জ্জন করিল—তিন পর্য্যন্ত গুন্‌বো। তারপরেই গুলি করব। এক—দুই—

—মোহনলালবাবু···

—আচ্ছা, তোমার কথায় আমরা রাজী। মোহনলাল বলিল।

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। তারপর অজ্ঞাত ব্যক্তি বলিল—তাহলে টেবিলের কাছ থেকে দূরে স'রে যাও।

সকলে ভয়চকিতচিত্তে পিছাইয়া গেল। ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে টেবিলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাঁ-হাতে টর্চ্চ, ডানহাতে পিস্তল। আলোর পিছনে দীর্ঘ কালো রেখা—মুখচোখ বা দেহের কোন অংশ দেখা যাইতেছে না।

—হীরেগুলো কোথায় ?

মোহনলাল জবাব দিল—শাদা মন্ত্রীর মধ্যে।

অজ্ঞাত ব্যক্তি টর্চ্চটা টেবিলের উপর রাখিয়া শাদা মন্ত্রীটা তুলিয়া পকেটে পুরিল। তারপর টর্চ্চ লইয়া আস্তে আস্তে পিছাইতে পিছাইতে বলিল—খবরদার! কেউ এগুবার চেষ্টা কোরো না। পিস্তল এখনো মেয়েটাকে লক্ষ্য ক'রে আছে। একটু যদি গোলমাল কর, তাহলেই গুলি করব!

ছায়ামূর্ত্তি দরজার কাছে পৌঁছিল; পুনরায় তাহার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও, তাহলে আমায় অনুসরণ করবার চেষ্টা করবে না। জকু এবং মেহের আলির কি অবস্থা হয়েছে, তা মনে রেখো।

বলিতে বলিতে অজ্ঞাত ব্যক্তি টর্চ্চ নিবাইয়া দরজার বাহিরে চলিয়া গেল। কয়েক মিনিট ঘরের ভিতরকার সকলেই নিস্পন্দ বিমূঢ়। তারপর মোহনলাল তীরবেগে দরজার কাছে গেল। কিন্তু ছায়ামূর্ত্তি তখন বহুদূরে চলিয়া গেছে···

হঠাৎ বাগানের মধ্যে ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল···পরক্ষণেই যন্ত্রণাসূচক চীৎকার!

পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিল।—বাগানে যেন চীৎকার শোনা গেল। মোহনলালবাবু···

মলয়ের কথার উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া মোহনলাল বলিল—কারুর সঙ্গে আমাদের বন্ধুর সংঘর্ষ লাগলো নাকি!

ইতিমধ্যে অজিত ঘরের আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল। বাগানের মধ্যে আর কোন শব্দ নাই। মলয় বলিল—চলুন, মোহনলালবাবু, বাগানটা দেখা যাক।

মোহনলাল কি বলিতে যাইবে, এমন সময় বাগানের কাঁকর-বিছানো পথের উপর ভারী জুতার শব্দ ধ্বনিত হইল। পদশব্দ সদরদরজা পর্য্যন্ত আসিল। তারপর প্রচণ্ড শব্দে ইলেক্‌ট্রিক বেল্ বাজিয়া উঠিল।

সকলে মিলিয়া ঘর হইতে দালানে গিয়া দাড়াইল। মোহনলাল অগ্রসর হইয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া উদয়চাঁদ দারোগা এবং তাহার কাঁধে একটি অচেতন মানুষের দেহ। দরজা খোলা হইতেই দারোগা ভিতরে আসিয়া অচেতন লোকটিকে একটি সোফায় শোয়াইয়া দিল। মূর্চ্ছিত লোকটির মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই মোহনলাল চমকিয়া উঠিল। এ যে তাহার বন্ধু ও সহকারী সতু !!

... ...

উদয়চাঁদ সংক্ষেপে বর্ণনা দিল—আমি মোহনলালবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসছিলাম। গেটের ভিতরে ঢুকেছি, এমন সময় বাগানের একদিকে মারামারির শব্দ শুনতে পেলাম। গেলাম ছুটে সেদিকে। দেখলাম, দূরে একটা লোক দৌড়ে পালাচ্ছে এবং এক ব্যক্তি একটা গাছের তলায় প'ড়ে গোঁ গোঁ করছে। আমি তখন এই ছোকরাটিকে তুলে নিয়ে এলাম। একে যেন চেনা চেনা লাগছে।

গম্ভীরমুখে মোহনলাল কহিল—এ আমার বন্ধু এবং সহকারী।

এর নাম সতু শিকদার। কলকাতা পুলিশ আপিসে হয়ত দেখে থাকবেন। আমি একে ফোন ক'রে কয়েকটা খবর নিয়ে এখানে আসতে বলেছিলাম। বাড়ীতে ঢোকবার সময় হয়ত ডাকাতটার সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং সতু জখম হয়।

চেতনা লাভ করিয়া এবং সুস্থ হইয়া সতু মোহনলালের কথাই সমর্থন করিল। তারপর মোহনলাল, সতু ও উদয়চাঁদ দারোগা উভয়কে শুনাইয়া বিগত ঘটনাবলী বিবৃত করিল। সতু অবাক হইয়া গেল। দারোগা কহিল—আচ্ছা সাহস তো, ঢুকলো কেমন ক'রে?

ঘাড় নাড়িয়া মোহনলাল কহিল—তা জানি না।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই জানা গেল। লাইব্রেরীঘরের একটা জানলা খোলা। সেখান দিয়াই সে আসিয়াছে এবং গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দারোগা কহিল—আরও একটু সতর্ক হতে হবে। কালপরশুর মধ্যেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করতে পারবো আশা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইতিমধ্যে সে হীরেগুলো নিয়ে পালালো।

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মোহনলাল কহিল—হীরেগুলো নিয়ে গেলে দুঃখের বিষয় হোত বৈকি!

চকিতকণ্ঠে দারোগা কহিল—তার মানে?

ধীরে সুস্থে মোহনলাল জবাব দিল—শাদা মন্ত্রীর মধ্যে হীরেগুলো ছিল, আমি তাকে তাই বলেছিলাম এবং সে শাদা মন্ত্রীটা নিয়ে গেছে। কিন্তু হীরেগুলো সত্যিই আছে আমার পকেটে!

ষোল

ঘরের মধ্যে বাক্যহীন বিস্ময়ের ঘোরে—মোহনলাল বলিতে লাগিল—আলো নিবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরে-ছিলাম, কিছু একটা গোলমাল। সঙ্গে সঙ্গে আমি জহরতগুলো মুঠো ক'রে টেবিল থেকে তুলে আমার পকেটে ভ'রে ফেলি এবং মন্ত্রীটার তলাকার অংশ জুড়ে তাকে সোজা ক'রে বসিয়ে রাখি। আমাদের বন্ধুটি ছিল ব্যস্ত, তাই সে যাচাই ক'রে দেখবার সময় পায়নি জহরতগুলো সত্যিই মন্ত্রীটার ভিতর আছে কিনা!

মলয় বলিল—আশ্চর্য্য! আমরা তো মোটেই বুঝতে পারিনি!

ঘাড় নাড়িয়া মাথা দুলাইয়া দারোগা কহিল—যাই হোক, খুব চালাকি ক'রে জহরতগুলো রক্ষা করেছেন। এখন একটা কথা। আপনারা সকলেই তার গলার স্বর শুনেছিলেন; স্বর শুনে তাকে চিন্‌তে পেরেছেন?

মোহনলাল হীরকখণ্ডগুলি সাবধানে কাগজে মুড়িয়া পুনরায় তাহার পকেটে রাখিয়া বলিল—না। বিকৃতস্বরে লোকটা কথা বলেছিল। স্বর শুনে চেনার উপায় নেই।

দারোগা সতুর দিকে ফিরিল। সতু জানাইল, গাঢ় অন্ধকারে সে লোকটার মুখ দেখিতে পায় নাই। তাছাড়া অতর্কিত

আক্রমণে সে নিজেকে সামলাইবার সময় পায় নাই—সুতরাং এখন দেখিলেও সে চিনিতে পারিবে না। ক্ষণকাল পরে মোহনলাল প্রশ্ন করিল—আপনি কি জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন দারোগা সাহেব?

দারোগা একবার মোহনলাল, আর-একবার অজিতের দিকে তাকাইল, তারপর গলা ঝাড়িয়া গম্ভীরভাবে ধীরকণ্ঠে বলিতে লাগিল—আজ মলয়বাবু জকুর লাশ সনাক্ত করবার পর আমি কলকাতার সদর থানায় অন্যান্য খবরের জন্যে ফোন করেছিলাম। তারা আমাকে লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ী থেকে হীরেচুরীর ঘটনা সবিস্তারে জানালে এবং বললে যে কিছুক্ষণ পরে জকুর বিগত জীবন সম্বন্ধে খবরাখবর তারা ফোনে আমাকে জানাবে। পনেরো মিনিট পরে সেখান থেকে ফোন এলো। তারা আমাকে অন্যান্য খবর দিয়ে জানালে যে মেহের আলির খুনের তদন্ত করবার জন্যে কলকাতার বড় ডিটেক্‌টিভ ইনস্‌পেক্টার কবীর এখানে আসছে।

মলয় উৎসাহিত হইল—কবীর! কখন্ আসছে?

—কাল-পরশুর মধ্যেই আসবে! অন্য একটি খবর পেলাম, যার জন্যে আমাকে এখন আসতে হল।

দারোগার মুখের পানে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিল—কি খবর পেলেন?

দারোগা বলিল—জকুর একটি স্ত্রী আছে। তার নাম ভৈরবী! সে-ও একজন মেয়ে-চোর; জেল খেটেছে দু'বার।

খবর পেলাম যে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বরাবর একযোগে কাজ করেছে। আমি মেয়েটার চেহারার বর্ণনা চাইলাম। তারা আমাকে বিশদভাবে তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছে!

দারোগা চুপ করিল। অন্য সকলেই নীরব, উন্মুখ। কী যেন একটা অনির্দেশ্য বিস্ময় ও ভয়ের ছায়া সকলের সামনে! মোহনলাল কহিল—বর্ণনা কারুর সঙ্গে মিলেছে?

ঘাড় নাড়িয়া দারোগা বলিল—মিলেছে বৈকি! এই বাড়ীরই কোন লোকের সঙ্গে মিলছে।

সকলে আর-একবার চমকিল। গম্ভীরস্বরে দারোগা বলিল—আমার বিশ্বাস, ভৈরবী আর মালতী একই লোক! সে-ই জকুর স্ত্রী!

মালতী! এ যেন স্বপ্নেরও আগোচর কল্পনা! কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা নাই। অবশেষে মলয় বলিল—কিন্তু অজ্ঞাত লোকটার সাহায্যকারী যদি মালতী হয়, তাহলে সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কাজ করছিল বলতে হবে!

ঘন ঘন মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে উদয়চাঁদ বলিল—এ সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি ব্যক্ত করছি, শুনুন আপনারা। জেল থেকে খালাস পেয়ে জকু জহরতের সন্ধানে এখানে আসে। অবশ্য জহরতগুলো যে এখানে আছে, তা সে জানলে কেমন ক'রে তা আমি এখনো ঠিকমত বুঝতে পারছি না। জকু যখন জেলে ছিল, তখন এই অজ্ঞাত ব্যক্তির সঙ্গে মালতীর যোগ-সাজস স্থাপিত হয়। এ-সব ধরণের মেয়েমানুষের কাছে

আপনারা সতীত্ব, নারীত্ব প্রভৃতি বড় বড় জিনিষ আশা করতে পারেন না। সুতরাং আমার বিশ্বাস, অজ্ঞাত লোকটার সঙ্গেই মালতীর বেশী সম্পর্ক ছিল এবং জকুর হত্যায় সে সহায়তা করেছিল।

মলয় বলিল—আপনার সিদ্ধান্ত মনে লাগছে না। তাহলে মেহের আলিকে হত্যা করলে কে, কেনই বা করলে!

স্থিরকণ্ঠে দারোগা বলিল—সে বিষয়েও আমি অনুসন্ধান নিয়ে কয়েকটি কথা জেনেছি। জকু যখন বরানগরে গিছল অজিতবাবুর জন্যে বই আনতে, তখন মেহের আলি তাকে দেখেছিল এবং চিনতে পেরেছিল। জকুর সম্বন্ধে সন্ধান নিয়ে সে জানতে পারে যে জকু অজিতবাবুর বাড়ী কাজ করছে। তাঁকে সতর্ক ক'রে দেবার উদ্দেশ্যেই মেহের আলি বোধ হয় রাত্রে এখানে আসবার চেষ্টা করেছিল, এমন সময় জকুর খুন সে নিজের চোখে দেখে; তারপর ওরা নিজেরা বাঁচবার জন্যে মেহের আলিকেও খুন করতে বাধ্য হয়।

উদয়চাঁদ তাহার সুদীর্ঘ বক্তব্য শেষ করিয়া নীরব হইল। ঘরের মধ্যে চাপা স্তব্ধতা। মিনিট দুই পরে মোহনলাল কহিল—দারোগা সাহেব, আপনি যে এতখানি বুদ্ধিমান, তা আমি আগে কল্পনা করতে পারিনি।

আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া দারোগা কহিল—অনেকদিন এ-লাইনে আছি মিঃ মিত্র! আচ্ছা, তাহলে এবার মালতীকে ডাকা যাক। দেখি সে কি বলে!

মালতীকে ডাকা হইল। কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না। শোনা গেল, ইতিমধ্যে রাঁধুনীকে জানাইয়া সে তাহার এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখিতে গিয়াছে। সম্ভবত রাত্রেই ফিরিবে! দারোগা মুখ গম্ভীর করিল ও বক্রোক্তিসহকারে বলিয়া উঠিল—যদি ফেরে! তার ফেরার আশা ছাড়তে হবে। সম্ভবত সে ফেরার হ'ল।

সতেরো

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উদয়চাদ দারোগা অপেক্ষা করিল। কিন্তু মালতী ফিরিল না। বিদায় লইবার আগে দারোগা জানাইয়া গেল যে, সে কাল আবার আসিবে এবং মালতী যদি ফেরে, তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

দারোগা চলিয়া গেল। মোহনলাল যেমন নীরব ছিল, তেমনি নীরবে রহিল। কি যেন একটা চিন্তার ভারে সে গম্ভীর অন্যমনস্ক। মালতীর সম্বন্ধে তখন নানা কথা হইতে লাগিল। মলয় এবং সতুর মনে সন্দেহের ছায়া পড়িয়াছে। অজিত উত্তেজিত বিমূঢ়। সকলে মোহনলালের মতামত জিজ্ঞাসা করিল। নিম্নকণ্ঠে মোহনলাল বলিল—সব জিনিষটা এখনো আমার মাথায় পরিষ্কারভাবে প্রবেশ করেনি, তবে আমার বিশ্বাস, মালতী ফিরে আসবে।

ইহার বেশী আর কোন কথা তাহার নিকট হইতে শোনা

গেল না। ধীরে ধীরে রাত বাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যূথিকার তাগাদায় সকলে শয়ন করিতে গেল বটে, কিন্তু সে-রাত্রে কেহই ঘুমাইতে পারিল না। সতু ও মলয়ের জন্য একটা ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বড় ঘর। দুইটা খাটে দুইটি বিছানা। উভয়ে নিদ্রা যাওয়া তো দূরের কথা, বালিশে মাথাও ঠেকাইল না। বসিয়া বসিয়া হত্যাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবশিষ্ট রাত কাটাইয়া দিল।

... ...

সকালে মালতী ফিরিয়া আসিল। জানা গেল, রাত্রে তাহার আত্মীয়টি মারা যায়, তাই রাত্রে সে ফিরিতে পারে নাই। মালতী যে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাতে অজিত মহা খুসী। মোহনলালের ঘরে গিয়া বলিল—মিঃ মিত্র! আপনার কথাই সত্যি, মালতী ফিরে এসেছে।

মোহনলাল দাড়ি কামাইতেছিল। কথা না বলিয়া শুধু ঘাড় নাড়িল। কিছুক্ষণ পরে সকলের সঙ্গে মোহনলালও বৈঠকখানাঘরে হাজির হইল এবং চা-পান করিয়া একাকী বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সতু মোহনলালকে একলা পাইয়া কহিল—ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনিও তো স্পিক্-টি নট্! কিন্তু...

অন্যমনস্কভাবে মোহনলাল বলিল—আর কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধর সতু। আজ রাত্রেই শেষ ঘটনা ঘট্‌বে আশা করছি। ইনস্‌পেক্টার

কবীর আজ আসবে না, কাল সকালে আসবে। সুতরাং 'অদ্যই শেষ রজনী'।

—মানে বুঝলাম না। কবীরের আসার সঙ্গে আজ রাতের কি সম্পর্ক আছে?

হেঁয়ালীর সুরে মোহনলাল বলিল—সেটা আজ রাত্রেই দেখবে।

... ...

দারোগা উদয়চাঁদও বিশেষ আগ্রহ ও উত্তেজনার সহিত আজ রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছে। মালতীকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া তাহার মেজাজ খারাপ হইয়া গেছে। যদি সে ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে দারোগা কি করিবে? এদিকে কলিকাতা হইতে ডিটেক্‌টিভ-ইনস্‌পেক্টার কবীর আসিতেছে, কিন্তু সে আসিবার আগে যে দারোগার কাজ শেষ করা চাই। আজ রাত্রের মধ্যেই সে এই ব্যাপারের চূড়ান্ত মিমাংসা করিবে।

আঠারো

সন্ধ্যার পর যথাসময়ে উদয়চাঁদ অজিতের গৃহে উপস্থিত হইল। সেখানে পৌঁছিয়া সে যখন শুনিল যে, মালতী ভোর-বেলাই ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন যুগপৎ তাহার মুখে হর্ষ এবং

নিরাশার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। দু'চার কথার পর সে একেবারে কাজের কথা পাড়িল। তাহার নির্দ্দেশমত মালতীকে ডাকা হইল। মালতী ভিতরকার কথা কিছুই জানে না; ঘরে আসিয়া অজিতের দিকে চাহিয়া বলিল—আমাকে ডাকছেন?

ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ বিব্রতভাবে অজিত কহিল—হ্যাঁ, দারোগা সাহেব তোমায় দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতে চান।

মালতী দারোগার পানে তাকাইল। স্তব্ধ-গম্ভীরভাবে মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দারোগা কহিল—তোমার নাম মালতী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এ-বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ নেই তো?

দারোগার প্রশ্নের ধরণে মালতী চমকিল, কিন্তু অবিচলিত-কণ্ঠে বলিল—না।

সবেগে দারোগা বলিল—আমি বলছি, তোমার নাম মালতী নয়। তোমার নাম ভৈরবী!

মালতীর দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। ঢোঁক গিলিয়া বলিল—আমার নিজের নাম আমি জানি না?

—জানো বৈকি! তবে স্বীকার করছ না। দারোগা হুমকি দিল—নাম বদল করেছো।

—আপনি···আপনি কি বলছেন···

শ্লেষাত্মককণ্ঠে দারোগা বলিল—বুঝতে পারছো না? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেদিন রাত্রে রঘু নামে যে লোকটি

এই বাড়ীতে খুন হয়, সে কে জানো? তার আসল নাম জকু অধিকারী এবং সে তোমার স্বামী।

মালতী মাথা নীচু করিয়া মেঝের উপর কি যেন দেখিতে লাগিল। দারোগা অধীরকণ্ঠে কহিল—বল, সত্যি কি না? অর্থাৎ জকু তোমার স্বামী কি না?

নিম্নস্বরে মালতী জবাব দিল—আমার বিয়ে হয়নি!

—ওসব ফন্দীবাজী চলবে না। অসহিষ্ণুভাবে দারোগা হাত নাড়িয়া কহিল—হয়ত জকুর অনেকগুলো এমনি ধারা 'স্ত্রী' ছিল, তুমি তাদেরই মধ্যে একজন···

তীব্রকণ্ঠে মালতী বলিয়া উঠিল—কখনো না। অনেকগুলো স্ত্রী তার ছিল না···

দারোগার মুখে বক্র হাসি ফুটিয়া উঠিল—বেশ! তুমিই না হয় তার একমাত্র স্ত্রী ছিলে। কিন্তু নাম বদলেছো কেন?

মালতী মাথা তুলিল; সহজকণ্ঠে বলিল—আমার খুসী! এতে কোন পাপ করিনি।

ঘাড় কাত করিয়া দারোগা বলিল—তা হয়ত করোনি। কিন্তু খুন করায় এবং খুন করার কাজে সহায়তা করায় পাপ আছে। জকুকে কে খুন করেছে তা তুমি জান।

—আমি···আমি জানি? মালতী যেন জ্বলিয়া উঠিল—জানলে তো ভালই হ'ত! তাহলে তাকে আমি···

হঠাৎ দারোগা যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িল—আমি বলছি, তুমি খুন করেছো জকুকে।

মালতী এবার যেন হতভম্ব হইয়া গেল—আমি খুন করেছি তাকে !···আপনি পাগল, আপনি পাগল !

—পাগল নই ! তুমিই খুন করেছো তাকে। প্রমাণ পাইনি এখনো ! তবে শিগ্গিরই পাব। আমি তোমার ঘর তল্লাস করতে চাই। কোন্ দিকে তোমার ঘর ?

ঘরের নির্দ্দেশ জানিয়া লইয়া দারোগা অজিতের দিকে ফিরিয়া কহিল—আমি এর ঘর খানাতল্লাসী ক'রে আসি, ততক্ষণের মধ্যে এ যেন পালায় না, দেখবেন। পালালে আপনাদের সাহায্য করার চার্জ্জে পড়তে হবে।

মোহনলাল কহিল—আপনি নিশ্চিন্তমনে চলে যান দারোগা সাহেব। মালতী এখানেই থাকবে।

দারোগা অদৃশ্য হইলে মৃদু হাসিয়া মোহনলাল বলিল—জবরদস্ত লোক। আটঘাট বেঁধে কাজ করছে। তারপর মালতীর দিকে ফিরিয়া কহিল—তাহলে তোমার আসল নাম ভৈরবী এবং তুমি জকুর স্ত্রী ?

মালতী ঘাড় নাড়িল। মোহনলাল প্রশ্ন করিল—জকুকে কে খুন করেছে তুমি জান ?

—না। আমি দিব্যি ক'রে বলছি, আমি জানি না। মালতীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মোহনলাল তাহার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—আচ্ছা, এই হীরেগুলো সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো ! জকুর সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু খবর জানি। সুতরাং তুমি যা জান, আমাদের কাছে বল।

অজিত কহিল—বল মালতী! আমাদের কাছে তোমার কোন ভয় নেই! হীরের খণ্ডগুলো এ-বাড়ীতে কেমন ক'রে এলো?

চকিতনেত্রে মালতী তাহার মুখের পানে তাকাইল। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—গদাধরবাবু এনেছিলেন।

—তিনি পেলেন কেমন ক'রে? প্রশ্ন করিল মলয়।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে মালতী কহিল—জকু লাভচাঁদ মতিচাঁদের গুদোম থেকে নেক্‌লেস সরিয়ে, সেটা গদাধরবাবুর কাছে বিক্রি করিয়ে দেবার জন্যে এনেছিল।

বিস্মিতকণ্ঠে অজিত বলিল—কাকা তাহলে চোরাই মালের কারবার করত?

ঘাড় নাড়িয়া মালতী বলিল—হ্যাঁ। জকুর সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয় ছিল। নেক্‌লেসটাকে ভেঙে হীরেগুলো টুকরো টুকরো ক'রে বেচবার মতলব করেছিল তারা!

মোহনলাল প্রশ্ন করিল—ইতিমধ্যে বুঝি জকু ধরা পড়ল?

মাথা নাড়িয়া মালতী কি বলিতে যাইবে, এমন সময় সশব্দে উদয়চাঁদ ঘরে ঢুকিল। তাহার চোখ মুখ আরক্ত স্ফীত। ক্রুদ্ধ গম্ভীরস্বরে বলিল—এইবার ভৈরবী ঠাকরুণ, তুমি কি বলতে চাও আমি শুনবো? এর কি জবাবদিহি তুমি করতে পার!

এই বলিয়া দারোগা পিছনদিক হইতে তাহার ডানহাতখানা ঘুরাইয়া আনিয়া মালতীর মুখের কাছে ধরিল, তাহার হাতে একখানা লম্বা সরু ছুরি, ছুরির গায়ে রক্ত শুকাইয়া আছে!

উনিশ

মালতী অস্পষ্ট ভয়ার্ত্ত শব্দ করিয়া উঠিল। স্তম্ভিত অজিত জিজ্ঞাসা করিল—ওটা কি দারোগা সাহেব?

তেমনি গম্ভীরভাবে দারোগা কহিল—জকু এবং মেহের আলিকে যে-ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে, এ সেই ছুরি! মালতীর ঘরে বিছানার তলায় পেলাম্।

—আমি জানি না! রুদ্ধশ্বাসে বলিল মালতী—আমি এর আগে এ-ছুরি দেখিনি!

মৃদু হাসিয়া দারোগা বলিল—জজের কাছে ব'লো, তিনি বিশ্বাস করবেন, না হয় না করবেন। এখন আমি তোমায় খুনের চার্জ্জে গ্রেপ্তার করলাম।

মোহনলাল এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। এইবার ধীর-কণ্ঠে কহিল—সেটা কি ঠিক হবে দারোগা সাহেব? আমার তো মনে হয়···

রুক্ষস্বরে দারোগা বলিল—ঠিক বেঠিক আমি বুঝবো মিঃ মিত্র! আপনি আমার কাজে বাধা দেবেন না!

মাথা নাড়িয়া মোহনলাল কহিল—বাধা দিচ্ছি না। আমি আপনার ভালর জন্যেই বলছি। মেয়েটাকে গ্রেপ্তার করে শেষে বিপদে পড়বেন, তাই···

—আচ্ছা, সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। দারোগা কহিল—প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে।

মোহনলাল কহিল—কিন্তু ও প্রমাণ সত্যি না হতেও পারে। কারণ, কাল রাত্রে আমি মালতীর অনুপস্থিতিতে তন্ন তন্ন ক'রে তার ঘর তল্লাস করেছিলাম। বিছানা, বাক্‌স কিছু দেখতে বাকি রাখিনি। কিন্তু এ-ছুরি তখন বিছানার নীচে ছিল না।

মোহনলালের কথা শুনিয়া সকলেই অল্পবিস্তর বিস্মিত হইল। দারোগা প্রশ্ন করিল—আপনি কেন এর ঘর তল্লাস করতে গিছলেন জানতে পারি কি ?

মোহনলাল বলিল—অজিতবাবু আমায় এই ব্যাপার তদন্ত করে দেখতে বলেছিলেন। তাছাড়া নিজের কৌতূহলও ছিল। যাই হোক, তল্লাস ক'রে ভাল করেছিলাম। একটি নিরপরাধ মেয়ে—

—নিরপরাধ! মোটেই নয়! দারোগা গর্জ্জন করিল—জানেন, এও একবার চুরীর দায়ে ধরা পড়েছিল !

—চুরী আর মানুষ খুন, এ দু'য়ের মধ্যে অনেক তফাৎ দারোগা সাহেব! যাই হোক, আমার পরামর্শ শুনুন, কলকাতা থেকে যতক্ষণ না চীফ্-ইনস্‌পেক্টার কবীর আসছে, ততক্ষণ একে গ্রেপ্তার করবেন না। কবীর এলে···

মোহনলালের পরামর্শ দারোগা মোটেই প্রসন্নমনে গ্রহণ করিল না। বলিল—কিন্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত মেয়েটা···

—আমি ওর জামিন রইলাম, দারোগা সাহেব। মোহনলাল বলিল—ও যাতে না পালায়, সে ব্যবস্থা আমি করব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দারোগা কহিল—বেশ। আপনার পরামর্শ মতই কাজ করব! নেহাৎ আপনি তাই, অন্য কোন লোক এ-ভাবে আমার কাজে বাধা দিলে, তাকে শুদ্ধ চালান দিতাম।

এই বলিয়া ছুরিখানা সাবধানে একটা কাগজে মুড়িয়া পকেটে রাখিয়া দারোগা অজিতের দিকে ফিরিয়া কহিল—হীরের খণ্ডগুলি বরঞ্চ পুলিশ ষ্টেশনে নিরাপদে রাখা যাক। সে-গুলো আমায় দিন!

মোহনলাল কহিল—কোন চিন্তা নেই দারোগা সাহেব! কারো সাধ্য নেই যে সেগুলো নিয়ে যেতে পারে! শেষকালে হীরে নিয়ে যেতে গিয়ে পথে আপনি বিপদে পড়বেন।

দারোগা বলিল—বেশ! আপনি যখন দায়িত্ব নিচ্ছেন, তখন বলবার কিছু নেই। অজিতবাবু, আপনার এখানে শক্ত গোছের লোহার সিন্দুক আছে; তারই মধ্যে হীরেগুলো সাবধানে রাখবেন।

মোহনলাল বলিল—আজ রাত্রে আর বোধ হয় কেউ আসবে না। কাল সকালে কবীর সাহেব এলেই ব্যস, নিশ্চিন্ত!

এই বলিয়া মোহনলাল দেরাজের উপর যে বড় ঘড়িটা ছিল, তাহার নীচেকার দোলকের ঘরটার ডালা খুলিয়া বলিল—

হীরেগুলি এইখানে রেখে দেওয়া যাবে! ছায়ামূর্ত্তির চোদ্দপুরুষও আন্দাজ করতে পারবে না—হীরে কোথায় আছে!

—যা হয় করুন। কিন্তু দেখবেন, এই স্ত্রীলোকটা যেন ইতিমধ্যে পালায় না। আচ্ছা, চললাম।

দারোগা উদয়চাঁদ প্রস্থান করিল।

... ...

কিছুক্ষণ পরে মালতী কার্য্যান্তরে যাইবার পর সতু বলিল—দারোগা যে মেয়েটাকে গ্রেপ্তার করলে না, এটা কিন্তু আশ্চর্য্য লাগছে!

মৃদু হাসিয়া মোহনলাল বলিল—আশ্চর্য্য মোটেই নয়। এর চেয়ে ঢের বেশী আশ্চর্য্যের ব্যাপার এখনো মজুত আছে। অজিতবাবু, একটা ছোট কাগজের বাক্স দিতে পারেন?

—কাগজের বাক্স? দেখি। বলিয়া অনেক খুঁজিয়া অজিত একটি ছোট এসেন্সের কাগজের বাক্স আনিয়া বলিল—চলবে?

—খুব চলবে।

মোহনলাল বাক্সটি লইয়া টেবিলের উপর রাখিল। তারপর পকেট হইতে হীরার টুকরোগুলি বাহির করিয়া তাহা গনিয়া গনিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিল। তারপর ছেঁড়া

কাগজ দিয়া বাক্সের ভিতরটা প্যাক করিয়া সুতা দিয়া বাঁধিয়া তাহা দেরাজের উপরকার ঘড়ির ভিতর রাখিয়া দিল।

ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে অজিত কহিল—কিন্তু জায়গাটা কি নিরাপদ হ'ল ?

—খুব নিরাপদ। এর চেয়ে নিরাপদ স্থান এ বাড়ীতে আর নেই। বলিয়া মোহনলাল মৃদু হাস্য করিল।

সতু কহিল—এখন তাহলে কি করা ?

—এখন, খাওয়া-দাওয়া-খোসগল্প, যতক্ষণ না কবীর আসছে !

—সে তো সেই কাল সকালে !

—হ্যাঁ, কাল সকাল পর্য্যন্ত এইভাবে কাটাতে হবে।

সতু বুঝিল, মুখে ঐ প্রকারের লঘুস্বরে কথা বলিলেও মনে মনে মোহনলাল কি যেন একটা সংকল্প আঁটিতেছে।

সতুর অনুমান যে মিথ্যা নয়, শীঘ্রই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

... ...

আহারাদি প্রস্তুত হইতে তখনো কিছু বিলম্ব আছে। সকলে উপরের ঘরে বসিয়া যেন আসন্ন-রাত্রির দুর্য্যোগের কথা ভাবিতেছে।

সতু ও মলয় দাবাখেলায় মাতিয়াছে। অজিত দর্শক। রামহরি কবিতা লেখায় নিমগ্ন। মহামায়া ও যুথিকা গল্প করিতেছে।

মোহনলালকে সে-তল্লাটে দেখা যাইতেছে না। বোধ হয় সে অন্য কোথাও ব্যস্ত আছে।

ফীডর রোডের আশেপাশের পল্লী নিস্তব্ধ নির্জ্জন! আকাশে মেঘের আনাগোনা। রাত্রে বৃষ্টি আসিতে পারে।

সেই নির্জ্জন পল্লীর একটি নিরালা পথে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। অত্যন্ত সন্তর্পণে সে ব্যক্তি পথ চলিতেছে। লোকটির মাথায় পাগড়ী বাঁধা। গায়ে চাদর জড়ানো। মুখ দেখা যাইতেছে না।

পথের ধারে গাছের ছায়ায় গা ঢাকা দিয়া লোকটি মোড়ের মাথায় আসিয়া একটা দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইল।

তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, সে যেন কাহারো জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

পাঁচ মিনিট...দশ মিনিট কাটিয়া গেল। লোকটি জামার তলা হইতে হাত বাহির করিয়া হাত ঘড়িতে সময় দেখিল।

সময় হইয়াছে।

লোকটি উৎকর্ণ হইল।...দূর হইতে যেন মোটরের শব্দ আসিতেছে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই একখানা কালো ঢাকা-মোটর নিঃশব্দে আসিয়া মোড়ের মাথায় থামিল।

গাড়ীতে একটি মাত্র লোক। সে-ই চালক। মোটর থামাইয়া চালক গাড়ী হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়

দেওয়ালের আড়াল হইতে পূর্ব্বোক্ত লোকটি সাঁ করিয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ড্রাইভার প্রথমে চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতে পিস্তল দেখা গেল।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কহিল—আমি হে! আমি!

নিঃশ্বাস ফেলিয়া ড্রাইভার বলিল—তাই বলুন! চম্‌কে উঠেছিলাম।

তখন দু'জনের মধ্যে ফিস্‌ফাস্‌ করিয়া অনেক কথা হইল। অবশেষে ড্রাইভার বলিল—তাহলে তাই ঠিক রইল। সকাল সাতটায় আমি আসছি।

গাড়ী চলিয়া গেল। তখন পূর্ব্বোক্ত সেই লোকটি ফীডর রোডে ঢুকিয়া তেমনি সন্তর্পণে সটান অজিতদের বাড়ীর পিছন দিকের পাঁচীল ডিঙাইয়া একেবারে বাড়ীর উপরে উঠিয়া গেল। কেহ তাহার গতিবিধির কথা জানিতে পারিল না।

পাঠকগণ বুঝিয়াছেন আশা করি যে, এ-ব্যক্তি মোহনলাল ভিন্ন আর কেউ নয়।

সেদিন রাত্রে আহারাদি শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। সকলেই বিশেষ শ্রান্ত এবং অবসন্ন বোধ করিতেছে। মহামায়া তো নীচে নামিলেনই না—উপরে নিজের ঘরেই আহার সমাধা করিলেন। কবি রামহরি কাব্যচর্চ্চায় ব্যস্ত। তাহারও বড় দেখা নাই।

আহারের পর যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। মোহনলাল

সতুকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল—মিনিট দশেক পরে আমার ঘরে এসো। কথা আছে।

দাসী-চাকরগুলাও খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া নিজেদের মহলে চলিয়া গেল। অজিত নীচেকার আলো নিবাইয়া দিল।

রাত বারোটার মধ্যেই সারা বাড়ী গভীর সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল যেন। দু'তিনজন ব্যতীত অন্য সকলেই নিরবিচ্ছিন্ন নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

বাহিরে অন্তহীন অন্ধকার রাত্রি স্রোতের মতো বহিয়া চলিয়াছে। উত্তর হইতে বহিয়া আসা শীতল বাতাসের ঝাপটায় গাছগুলা মাঝে মাঝে মাথা নোয়াইয়া প্রতিবাদ জানাইতেছে। আকাশে চাঁদ নাই। দিগন্ত ব্যাপিয়া পাত্‌লা মেঘের আস্তরণ বিছানো। বহু দূরে বোধ হয় বৃষ্টি হইতেছে। বাতাসে তাহারই আভাস।

অজিতের বাড়ীর বাগানে অন্ধকার গাছের তলায় দাঁড়াইয়া তদধিক অন্ধকার এক কালো দীর্ঘ ছায়া উর্দ্ধমুখে বাড়ীর পানে তাকাইয়া আছে। কতক্ষণে বাড়ীর আলোগুলা নিভিবে!

ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল। সময় হইল বুঝি। নিশাচর ছায়ামূর্ত্তি গাছের তলা হইতে বাহির হইল।

একতালার একাংশে একটা ছোট ঘরে বসিয়া মালতী। বসিয়া বলিলে ভুল হইবে। অত্যন্ত উত্তেজিত এবং ব্যস্ত মালতী।

দেখিলে মনে হয়, সে যেন কোথাও বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে। আঁটসাঁট করিয়া কাপড় পরা; গায়ে একখানা চাদর জড়ানো। পায়ের কাছে ছোট একটা পুঁটুলি। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই, সাড়ীর নীচে কোমরে তাহার গোঁজা রহিয়াছে একটি পিস্তল! সহজ মেয়ে নয় মালতী!

এই ছোট ঘরটিতে মালতী থাকে। খুচরা জিনিষ তাহার নিতান্ত কম নয়; কিন্তু সে-সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া সে শুধু দু'খানা কাপড় এবং দুইটা ব্লাউজ লইয়াছে। কতকগুলা কাগজ-পত্র ছিল—তাহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। মালতীর কার্য্যকলাপ রীতিমত সন্দেহজনক! সে কি পলায়নের যোগাড় করিতেছে?

সিঁড়ির বড় ঘড়িটায় ঢং করিয়া শব্দ হইল। রাত একটা বাজিল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মালতী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল। বাহির হইবার আগে নিজের ঘরের আলো নিবাইতে ভুলিল না।

চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার! থমথমে জমাট অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। কিন্তু মালতীর তাহাতে অসুবিধা নাই। ঘর, দুয়ার, দালান, বারান্দা সমস্তই তাহার অভ্যস্ত।

তবুও খুব সন্তর্পণে মালতী অগ্রসর হইতে লাগিল। নাঃ! কেহ জাগিয়া নাই। উপরতালা অন্ধকার ও নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মালতী একটা বড় ঘরে ঢুকিল। এই ঘরে সন্ধ্যার পর মোহনলাল দেরাজের উপরকার ঘড়ির মধ্যে হীরকখণ্ডগুলি রাখিয়া গেছে! মালতীর লক্ষ্য সেইদিকে!

এখানেও অন্ধকার বলিয়া তাহার কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। সোজা সে দেরাজের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। দেরাজের উপর ঘড়িটা টক্ টক্ শব্দে চলিতেছে! মালতী কম্পিতহাতে ঘড়ির তলাকার ছোট ঢাক্‌নাটা খুলিল। ভিতরে হাত ঢুকাইতেই কাগজের বাক্‌সটা তাহার হাতে ঠেকিল। বাক্‌সটা সে বাহির করিয়া আনিল। এমন সময়…

পিছনে কি যেন শব্দ! মালতী বিদ্যুৎবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

কয়েক হাত দূর হইতে বিকৃত ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—নড়াচড়া কিম্বা চেঁচামেচি করবার চেষ্টা করলেই গুলি করব! চুপ ক'রে দাঁড়াও।

মালতী বুঝিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার স্বামীর হত্যাকারী ও মেহের আলির হত্যাকারী অজ্ঞাত ছায়ামূর্ত্তি!!

বিশ

এক মুহূর্ত্তে মালতী যেন পাষাণে পরিণত হইল। নিজের বুকের ধক্‌ধক্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ তাহার কানে আসিতেছে না; হাত-পা কাঁপিতেছে; গলার ভিতরটায় কুণ্ডলী পাকাইতেছে।

সাপের মত ফোঁস ফোঁস শব্দে অদৃশ্য আগন্তুক বলিতে লাগিল—ভেবেছিলে আমায় ফাঁকী দেবে! আমি জানতুম, তুমিও আজ রাত্রে এই রকম একটা কিছু করবে। অনেক

বাড়ীর সিন্দুক ভেঙেছো তুমি। স্বামীর সঙ্গে এক জোটে অনেকের সর্ব্বনাশ করেছো! কিন্তু আমার কাছে ওসব চালাকি খাটে না।

—কে তুমি? মালতী প্রশ্ন করিল।

অস্ফুট হাসির ঝঙ্কার শোনা গেল—আমাকে না জানাই ভাল। যারা জেনেছে আমার পরিচয়, তারা আজ বেঁচে নেই; আমাকে চিনেছিল বলেই জকু আর মেহের মারা পড়ল। তুমি চিনলে তোমারও ঐ অবস্থা হবে।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া মালতী কহিল—তুমি…তাহলে তুমিই মেরেছো জকুকে…

—চুপ ক'রে থাক! ছায়ামূর্ত্তি গর্জ্জন করিল—কোমরে পিস্তল আছে জানি। কিন্তু আমার হাতের পিস্তল প্রস্তুত… হুঁসিয়ার, এখনি গুলি করব। হাত সরাও।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ্চের তীব্র আলো মালতীর দু'চোখ ঝলসিয়া দিল। আলোর পিছনে লোকটাকে কিছুই দেখা যাইতেছে না—শুধু একটা কালো রেখা।

—হাত নামাও।

মালতী দুই হাত নামাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিকৃতস্বরে মূর্ত্তি বলিতে লাগিল—হ্যাঁ, আমি মেরেছি জকুকে—খুন করেছি তাকে ছুরি মেরে।

কম্পিতকণ্ঠে মালতী কহিল—কেন তাকে খুন করলে? সে তো তোমার কোন অনিষ্ট করেনি।

ছদ্মবেশী জবাব দিল—সে-রাত্রে বাগানের মধ্যে আমায় সে চিনতে পেরেছিল। সে যদি আমার কথা শুনতো, তাহলে তাকে মরতে হ'ত না। আমি তাকে ভাগ দেব বলেছিলাম। কিন্তু সে তাতে রাজী হল না। কথা বলবার সময় আমার মুখোসটা যায় স'রে, সে আমায় চিনে ফেলে। সুতরাং তাকে খুন করতে হল।

মালতী কহিল—সয়তান! মনে করেছো, কেউ কখনো তোমায় চিনতে পারবে না!

—যে পারবে, সে-ই মরবে! মেহের আলিও নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করত।

আবার মালতী প্রশ্ন করিল—মেহের আলিকে মারলে কেন?

চতুর মালতী কেবলমাত্র সময় কাটাইবার জন্য তাহার আততায়ীকে এইভাবে কথায় নিযুক্ত রাখিতে চাহিতেছিল, এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে সে নিজের নিষ্কৃতির উপায় কল্পনা করিতেছিল।

মূর্ত্তি বলিল—বাধ্য হয়ে তাকে মারতে হ'ল। জকুকে শেষ ক'রে আমি বাগান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একেবারে তার সামনে। আর একটু হলে সে আমায় ধ'রে ফেলেছিল! তখন বাধ্য হয়ে···কিন্তু না, আর বাজে কথা নয়, দেরী হয়ে যাচ্ছে, দাও হীরেগুলো!

মালতী কহিল—নেহাৎ পিস্তল রয়েছে তাই, নইলে···

মূর্ত্তি হাসিল—নইলে…হুঁ! আচ্ছা, আর কথায় দরকার নেই; দাও।

—এই নাও। বলিয়া মালতী হঠাৎ এক বিষম কাণ্ড করিল। জহরতপূর্ণ সেই ভারী বাক্সটা সজোরে মূর্ত্তির মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। ভাগ্যক্রমে লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না—বাক্সটা গিয়া পড়িল মূর্ত্তির মুখের উপর, বোধ হয় নাকে লাগিল আঘাত, মূর্ত্তির মুখ দিয়া অস্ফুট যন্ত্রণার ধ্বনি বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত হইতে টর্চ্চটা মাটিতে পড়িয়া গেল! মালতী তখন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত এক অসমসাহসিক কাজ করিল—চিলের মতো ছোঁ মারিয়া বাঁ-হাতে টর্চ্চটা কুড়াইয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কোমর হইতে নিজের পিস্তল বাহির করিল। ছায়ামূর্ত্তি কয়েক মুহূর্ত্ত বিহ্বল থাকিয়া তাহার পিস্তল উঁচাইতে গেল, কিন্তু পারিল না। বিদ্যুৎগতিতে মালতী তাহার হাতের পিস্তলের বাঁট দিয়া মূর্ত্তির ডানহাতের মণিবন্ধে আঘাত করিল। 'উঃ' শব্দ করিয়া অজ্ঞাতব্যক্তি হাত সরাইয়া লইল, পিস্তলটা ছিট্‌কাইয়া পড়িল দূরে!

ক্ষিপ্তা বাঘিনীর মত পিস্তলটার দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে পা দিয়া আরও দূরে সরাইয়া দিয়া মালতী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের পিস্তল অজ্ঞাত ব্যক্তির ললাটের প্রতি নিবদ্ধ! দুই চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে! এ-মালতীকে চেনা যায় না!

—এইবার আমার পালা! হিংস্র ফনিণীর মত মালতীর

চাপা গর্জ্জন শোনা গেল—দেওয়ালের কাছে স'রে গিয়ে দাঁড়াও। আমি তোমার মুখোস-ছাড়া মুখ দেখতে চাই। খবরদার!…এখনি গুলি করব!

অজগরের বেষ্টনে বন্য মহিষ যেমন অসহায় বোধ করে, অজ্ঞাত হত্যাকারীর অবস্থাও তেমনি। চোখের সামনে উঁচানো পিস্তলের নল! উন্মাদিনী রমণী। হিতাহিত জ্ঞান নাই। সুতরাং তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইল।

—খুলে ফেলো মুখোস! নারী আবার গর্জ্জন করিল—খুলে ফেলো! আমি দেখতে চাই তার স্বরূপ যে খুন করেছে জকুকে। খুলবে না? খুলবে না? এক—দুই…

—খুলছি! খুলছি! বলিতে বলিতে অজ্ঞাত মূর্ত্তি বা-হাত দিয়া তাহার মুখের আচ্ছাদন টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।

এ কি! এ কী বিস্ময়! এক নিমেষে মালতী যেন বজ্রাহত পঙ্গু হইল! ইহা যে সমস্ত কল্পনার অতীত! মালতী নিজের চোখ দুটাকে যেন সহসা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। বিস্ময়ের অসহ্য ধাক্কায় সে বিচলিত হইল; কহিল—এ কি…আপনি…

লোকটা তাহার এই বিস্ময় ও বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিতে-ছিল এবং তাহার সুযোগ লইতেও বিলম্ব করিল না।

নিজের অজ্ঞাতসারেই মালতীর পিস্তলসমেত হাতখানা নামিয়া পড়িয়াছিল, লোকটা তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া মালতীর সেই হাতখানা চাপিয়া মুচড়াইয়া ধরিল! চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে এই ব্যাপার ঘটিয়া গেল!

দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মালতী পিস্তল ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আততায়ী দু'হাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল।

—আমাকে তুমি চিনতে পেরেছো! কিন্তু তাতে তোমার কোন লাভ হল না। আমার পরিচয় তুমি এখনি পরপারে বহন করে নিয়ে যাবে।

টর্চটা নিবিয়া গেছে। ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকার! মালতী চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। লোহার সাঁড়াসীর মত দু'খানা শক্ত হাত তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া রুদ্ধ করিয়াছে···

কপালের শিরগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে···মাথার ভিতরে যেন রক্তের স্রোত—দুই চোখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে··· ঝাপসা দৃষ্টির সাম্‌নে অগুন্‌তি তারা নাচিতেছে···পৃথিবীতে বুঝি বাতাস নাই···অন্ধকার···

মালতীর দেহের শক্তি ফুরাইয়া গেছে···আর কিছুক্ষণের মধ্যেই···

এমন সময় মনে হইল যেন, ঘরের বাহিরে কি শব্দ হইল। আলোর প্লাবন। ঘর আলোয় ভরিয়া গেছে।

মালতী আবার জীবিতের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে! লোকটা তাহার গলা ছাড়িয়া জানলার দিকে ছুটিয়া যাইতেছে! ঘরে বোধ হয় অন্য লোক ঢুকিয়াছে!

মোহনলালের কণ্ঠস্বর:

—ওকে ধরো সতু! পালাতে দিও না!

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া মোহনলাল! মালতী টলিতে টলিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া একটা আলমারির কোণ ধরিয়া ফেলিল।

সুদক্ষ খেলোয়াড়ের মত লাফ দিয়া সতু নিজেকে জানলার দিকে নিক্ষিপ্ত করিল। লোকটা তখন জানলার উপরে।

সতুর দুই হাত তাহার কোমর বেষ্টন করিল।

প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি! পায়ের চোট্ লাগিয়া পাশের আলমারির কাঁচ ভাঙিয়া পড়িল।

চীৎকার এবং ধস্তাধস্তির শব্দে অজিত ও মলয় ইতিমধ্যে নামিয়া আসিয়াছিল। দ্বারপ্রান্তে দাঁডাইয়া তাহারা অভিভূতের মত ভিতরকার দৃশ্য দেখিতেছিল···

কাছেই মালতী দাঁড়াইয়া। অজিত তাহার পানে চাহিয়া কহিল—মালতী! এ কী ব্যাপার?

ততক্ষণে মোহনলাল ও সতু উভয়ে মিলিয়া আততায়ীকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে।

মোহনলাল হাঁকিল—অজিতবাবু, এইদিকে আসুন! বাঁধুন দেখি দড়ি দিয়ে লোকটার হাত পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে।

দড়ির অভাবে পরণের কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া লোকটার হাত বাঁধা হইল!

মোহনলাল বলিল—এইবার মহাপুরুষের শ্রীমুখখানা দেখা যাক! সকলে খুব একটা বিস্ময়ের জন্যে প্রস্তুত হও।

লোকটা বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মোহনলাল তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল।

ঘরের মধ্যে যেন বিস্ময়ের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! অকল্পিত! অসম্ভব!

—এ যে উদয়চাঁদ দারোগা।

মোহনলাল কহিল—আপনার ভুল হয়নি মলয়বাবু! উদয়-চাঁদই বটে!

বিমূঢ়ের মত অজিত কহিল—এর মানে!

মোহনলাল জবাব দিল—এর মানে এই যে আমরা সেই অজ্ঞাত ছায়ামূর্ত্তিকে ধরেছি, জকু এবং মেহের আলি যার হাতে প্রাণ হারিয়েছে!

অজিত তখনো বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

—আপনার কথা তাজ্জব বলে মনে হচ্ছে মিঃ মিত্র! উদয়চাঁদ দারোগা খুন করেছে ওদের!

—নিঃসংশয়ে! মোহনলাল বলিল—এইমাত্র মালতীর কাছে লোকটা নিজের বড়াই করছিল, বলছিল যে ওই খুন করেছে তাদের, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি আর সতু শুনেছি!

অজিত কহিল—অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

ঘাড় নাড়িয়া মোহনলাল কহিল—তাতে আর সন্দেহ নেই! কিন্তু এ সত্যি! বহুদিন ধ'রে উদয়চাঁদ এই হীরেগুলো সংগ্রহ করবার চেষ্টায় ছিল। কাশীপুরে নেক্‌লেস চুরীর ব্যাপার সে

সমস্তই জানতো; তবে নেক্‌লেস বা হীরেগুলোর কি গতি হল, তা সে প্রথমে জানতে পারেনি!

ঘরের মধ্যে স্তব্ধ বিহ্বলতা! উদয়চাঁদ দারোগা ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সতু তাহাকে পাহারা দিতেছে। ঘরের এক কোণে দেওয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া মালতী হাঁ করিয়া মোহনলালের কথা শুনিতেছে।

মোহনলাল বলিতে লাগিল—জকুকে উদয়চাঁদ বিলক্ষণ চিনতো; তাই সে যখন অজিতবাবুর বাড়ী চাকরী নিলে এবং উদয়চাঁদ যখন তাকে দেখতে পেলে, তখনই সে আবার চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। দুই আর দু'য়ে চার—অর্থাৎ জকু যখন এ-বাড়ীতে চাকরি নিয়েছে, তখন নেক্‌লেস নিশ্চয়ই এই বাড়ীতে আছে। উদয়চাঁদ তখন অজিতবাবুদের ভয় দেখিয়ে, যাতে তাঁরা এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যান, তার চেষ্টা করতে লাগল এবং সেই উদ্দেশ্যেই ইঁটের সঙ্গে কাগজ এঁটে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিতে লাগল। কেমন ঠিক নয়, রোসেন্‌?

'রোসেন্‌' নামটা শুনিয়া উদয়চাঁদ চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—এ নাম জানলেন কেমন ক'রে?

মৃদু হাসিয়া মোহনলাল বলিল—শুধু এই নামটাই নয়, তোমার আরও অনেক কীর্ত্তিকলাপের খবর আমি জানি। তুমি ভেবেছিলে, তোমার দুটো পরিচয় কেউ কোনদিন জানবে না; চোরাইমালের কারবারি রোসেন আর দারোগা উদয়চাঁদ যে একই

লোক তা জানা অবশ্য শক্ত ছিল বৈকি! বহুদিন সাফল্যের সঙ্গে তুমি দুটো কাজই চালিয়ে আসছিলে। কেউ কোন দিন সন্দেহ করতে পারেনি। অবশেষে মাস দুই আগে কলকাতার পুলিশের প্রথম সন্দেহ হয়। আলমবাজারের পানুগুণ্ডা একটা ডাকাতির পর ধরা প'ড়ে স্বীকার করে যে গহনাগুলো সে রোসেন ব্যাপারিকে বেচেছে! এই কেনা-বেচা সম্পন্ন হয় গঙ্গার ধারে পোলের তলায় এবং যে-ব্যক্তি পানুর কাছ থেকে মাল কেনে, সে মোটরে গিয়েছিল এবং তার মুখে ছিল মুখোস।

মুহূর্ত্তকয়েক নীরব থাকিয়া মোহনলাল আবার সুরু করিল—ছদ্মবেশী ব্যাপারির সম্বন্ধে পানু আর-কোন বিবরণ দিতে পারেনি। শুধু তার আর-একটা বর্ণনা সে দিয়েছিল; সে বলেছিল, সেই ব্যাপারির বাঁ-হাতের ক'ড়ে আঙুলে একটা মিনে-করা শিল-আংটি ছিল···

বলিতে বলিতে মোহনলাল ঝুঁকিয়া উদয়চাঁদের বাঁ-হাতখানা টানিয়া লইয়া বলিল—সে-আংটিটা এখনো যথাস্থানেই রয়েছে রোসেন!

উদয়চাঁদ অস্ফুটে কি উক্তি করিল, বোঝা গেল না; অজিত আর মলয়ের বিস্ময়ের সীমা নাই।

মোহনলাল কহিল—এ সম্বন্ধে সন্দেহের কথা আমায় প্রথম জানায় ডিটেক্‌টিভ্-ইনস্‌পেক্টার কবীর। তাই আমিই তাকে ফোন করে এখানে আসবার জন্যে বলেছিলাম। আমি অনুমান করেছিলাম, কবীরের আসবার আগেই উদয়চাঁদ তার কাজ

হাসিল করবার চেষ্টা করবে। আমার অনুমান ব্যর্থ হয়নি। যদিও ঘড়ির মধ্যেকার বাক্সটায় হীরের টুকরো ছিল না— ছিল ছোট ছোট কয়লার টুক্‌রো! আমি কিছুক্ষণ আগে এক সময় বাক্স বদল করে রেখে যাই। আসল জিনিষ আমার পকেটে! ঘণ্টাখানেক আগে ফীডর রোডের মোড়ে কবীরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে এখুনি আসবে।

... ...

টেলিফোন করিবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই আধ ডজন সেপাই-সান্ত্রী লইয়া বরাহনগর থানার ভারপ্রাপ্ত ইনস্‌পেক্টার আসিয়া হাজির! মোহনলালকে সে চিনিত! কিন্তু তবুও উদয়চাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া সে বিমূঢ় হইয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত মোহনলালের দায়িত্বে সে উদয়চাঁদকে গ্রেপ্তার করিল এবং স্থির হইল, ইনস্‌পেক্টার কবীর আসা পর্য্যন্ত তাহারা এইখানেই অপেক্ষা করিবে।

পুলিশের লোকজন নীচে রহিল। বাড়ীর সকলে উপরে উঠিয়া একটি ঘরে জমায়েৎ হইল। বলা বাহুল্য গোলমালে যুথিকা, মহামায়া, রামহরি এবং চাকর-বাকর সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছিল।

যুথিকা সকলকে চা তৈরী করিয়া দিল। রাত শেষ হইয়া আসিতেছে! গাছের মাথায় মাথায় ধূসর ছায়া।

অজিত কহিল—মোহনলালবাবু, আপনি এ-ব্যাপার প্রথম কবে জানলেন? আপনি তো হঠাৎ এখানে এসেছিলেন…

মৃদু হাসিয়া মোহনলাল কহিল—আমার সব কথা এখনো বলা হয়নি। কিন্তু বলবার আগে অজিতবাবুদের কাছে মিথ্যা-ভাষণের অপরাধের জন্যে মাপ চাই। এখানে আমার আসাটা দৈবচক্রে নয়—সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত! আমি চোর ধরতেই এ-তল্লাটে এসেছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে এই: বহুদিন ধ'রে বারবার কলকাতা পুলিশের কাছে খবর যাচ্ছিল যে বরানগর থেকে আলমবাজার—এই অঞ্চলে নানারকম চুরী এবং বিশেষ করে চোরাই মালের কেনাবেচা চলেছে। একটা লোক সমস্ত চোরাই মাল কিনছে, কিন্তু লোকটার পরিচয় কেউ জানে না—তার স্বরূপও কেউ কখনো দেখেনি। কলকাতা থেকে একজন গোয়েন্দাকে পাঠানো হয় এবং কিছুদিন পরে সে যা রিপোর্ট দেয়, তাতে উদয়চাঁদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই সময় কিছুদিন আর সেই ব্যাপারির কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি—বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছিল যে পুলিশের অন্য লোক তাকে সন্দেহ করতে সুরু করেছে। তাই সে কিছুদিন গা ঢাকা দেয়। তারপর পান্নু গুণ্ডা ধরা প'ড়ে যে সব কথা বলে তাতে আবার সন্দেহ জাগ্‌ল। সেই সময় কলকাতার কমিশনর সাহেব আমায় ব্যাপারটা তদন্ত ক'রে দেখবার জন্যে অনুরোধ করেন। কাশী-পুরের লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ী থেকে হীরেচুরীর ঘটনা আমি জানতাম, এবং আমি এও জানতাম যে, গদাধরবাবু চোরাইমাল

কেনা-বেচা করেই পয়সা করেছে। যখন শুনলাম যে অজিতবাবুরা এ বাড়ীতে এসেছেন, তখন ভাবলাম, একবার এ-বাড়ীটা দেখবো এবং এখানে দু'চারদিন থেকে এ-অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাবো। কবীরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গদাধরের বন্ধু সেজে আমি এখানে এসে উঠি! তারপর যা ঘটেছে, তা আপনারা সকলেই জানেন, সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন মলয়বাবুকে অনুরোধ, এ ব্যাপারের 'নিজস্ব সংবাদ' যা ছাপাবেন, তার মধ্যে দয়া ক'রে এই অধমের নামটিকে উহ্য রাখবেন।

যুথিকা বলিল—ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন মোহনলালবাবু, তা না হলে হয়ত ডাকাতটার হাতে আমাদেরও মারা পড়তে হ'ত।

মোহনলাল বলিল—মারা পড়া কি এত সহজ যুথিকা দেবী। আমি না এলে অন্য কেউ এসে এই ব্যাপারের মিমাংসা করতেন। যাই হোক, এখন আপনারা নিষ্কণ্টক হলেন; সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে একটা প্রকাণ্ড ভোজের আশা করি। কী বলেন অজিতবাবু!

এই বলিয়া মোহনলাল, যুথিকা ও মলয়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

যুথিকা তাড়াতাড়ি বলিল—আপনাদের চা ফুরিয়ে গেছে; আরও চা আনি। মালতী কোথায় গেল। মালতী, মালতী!

মালতীর সাড়া পাওয়া গেল না। ভৃত্য হটু আসিয়া জানাইল, মালতী নাই, চলিয়া গেছে।

চলিয়া গেছে ! কোথায় গেল ?

কিছুক্ষণের মধ্যে অনুসন্ধানে জানা গেল, কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া, খিড়কি দরজা দিয়া মালতী বাহির হইয়া গেছে। পলায়ন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মোহনলালের নির্দ্দেশে ব্যাপারটা লইয়া কেহ কোন হৈ চৈ করিল না—বেমালুম চাপিয়া গেল। পুলিশ কিছু জানিতে পারিল না !

স্পষ্টই বোঝা গেল, নিজের অতীত-জীবনের দুষ্কৃতির ভয়ে এবং পুলিশের হাতে লাঞ্ছনার আশঙ্কায় মালতী পলায়ন করিয়াছে।

শেষ

এই পুস্তকের প্রথম তিন ফর্ম্মা শুক্লা প্রেসে মুদ্রিত
অবশিষ্ট অংশ দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার প্রেস,
১০৬, কটন ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ

পরবর্ত্তী গ্রন্থ

নরপিশাচ

এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রকারী নরপিশাচ সয়তানের কবলে রহস্যময়ী তরুণী !

ছদ্মবেশ ধারণের অভিনব জালিয়াতি !

ঘটনার চাপে পাঠকের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইবে।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রোমাঞ্চ ও রহস্যের প্রবাহ।

ডিটেক্‌টিভ মোহনলালের আর-এক কীর্ত্তি ! রহস্য-কেন্দ্রে সুন্দরী তরুণী ! তাহার অসমসাহসিক কার্য্যকলাপে মোহনলাল পর্য্যন্ত অভিভূত।

নূতন ধরণের চরিত্রসৃষ্টি।

নূতনতর বিভীষিকা।

প্রশংসাধন্য উপন্যাস
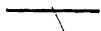
সুদূরের পিয়াসী

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ প্রণীত

আধুনিক যুগের একখানি চিত্রগ্রাহী উপন্যাস।

"সুদূরের পিয়াসী" পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। ...কালির আঁচড়ে দৃষ্ট নরনারীকে পাঠকের মনে জীবন্ত করিয়া তোলার মূলে যে অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যাপক সহানুভূতি আবশ্যক—এই লেখক সেই দুর্লভ গুণের অধিকারী।... বাংলার পাঠক-সমাজে এই উপন্যাসখানির আদর হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"সুদূরের পিয়াসী" নামক বইখানির স্বকীয়তা এই কারণে স্বীকৃত যে, এর মধ্যে গল্পের ধারা ও ভ্রমণের আনন্দবেদনা সংযুক্ত হ'য়ে অভিনবত্ব লাভ করেছে।... লেখকের কবিত্বময় ভাষা রচনা ও প্রকাশ-যোগ্যতার মধ্যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিঃসংশয়ে নিহিত।...

—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্ন্যাল।

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী রচিত

উপচয়নী

বাংলা উপন্যাসের প্রথম ওম্‌নিবাস।

পাঁচখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একত্র সংগ্রহ।

"এইরূপ উপন্যাস সংকলনের চেষ্টা এই প্রথম। প্রথম চেষ্টাতেই প্রকাশকগণের উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই খণ্ডে আছে, রবীন্দ্রনাথের "নষ্ট নীড়", চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হেরফের", সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "বৈরাগ-যোগ", প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর "প্রবাসী" এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "অমলা"। সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশকগণের নির্ব্বাচন-পদ্ধতি প্রশংসনীয়। ছাপায়, কাগজে ও সজ্জায় এই ৪৫০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে যে-ভাবে অর্থব্যয় করা হইয়াছে, তাহাতে ৫৲ মূল্য অতিরিক্ত হয় নাই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ই অক্টোবর ১৯৩৯।

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মূল্য-তালিকা

বঙ্গদর্শন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯ম খণ্ডের সম্পূর্ণ সেট (সাধারণ সংস্করণ) ... ৩৬৲
ঐ ঐ (শোভন ,,) ... ৪৫৲

জ্ঞান-ভারতী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৩য় খণ্ডে সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ) ... ১৮৲
প্রতি খণ্ড ... ৬৲
ঐ ঐ (শোভন ,,) ... ২৪৲
প্রতি খণ্ড ... ৮৲

বাংলার পুরনারী—দীনেশচন্দ্র সেন ... ৫৲

উপচয়নী—রবীন্দ্রনাথ ও অন্য চারজনের
পাঁচখানি উপন্যাস একত্রে ... ৫৲

হোআট্ ইণ্ডিয়া থিংক্স—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ
লেখকগণের ইংরাজী মৌলিক প্রবন্ধ ... ৭৲

মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়—
ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল ... ৩৲

হাতের কাজ— ঐ ঐ ... ১৲

অমলার অদৃষ্ট—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ... ১।০

বেলাইন— ঐ ঐ ... ১।০

সুদূরের পিয়াসী—শ্রীসুমথনাথ ঘোষ ... ১॥০

রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ—

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিমাসে প্রকাশিত
উপন্যাস সিরিজ। প্রতি গ্রন্থ ... ।৵০